আনন্দমেলা

এই সংখ্যায়
শুরু হল
লীলা মজুমদারের
ধারাবাহিক উপন্যাস

নোটোর দল

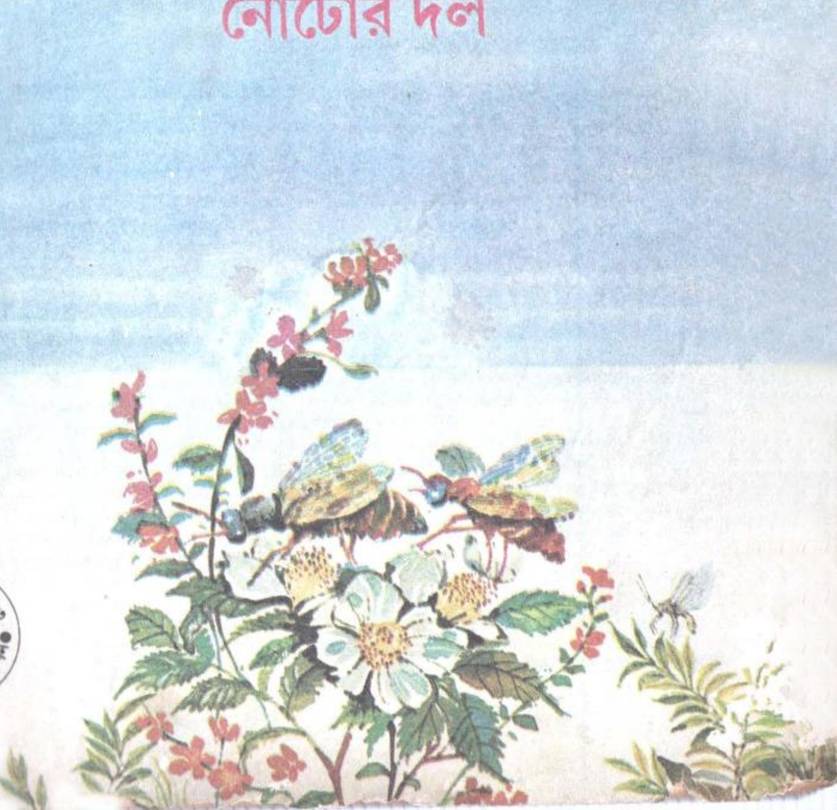

২১শে টবর ১৯৮৩
২.৫০
আনন্দবাজার-প্রকাশন

রেক্সোনা আপনার ত্বকের যত্ন নেয়...

ত্বক রাখে কোমল ও উজ্জ্বল!

রেক্সোনায় আছে চারটি প্রাকৃতিক তেলের মিশ্রণ—
কেড, ক্যাসিয়া (দারুচিনি বিশেষ), লবঙ্গ আর টেরিবিন্থ।
রেক্সোনা মেখে স্নান করুন—এ আপনার ত্বক রাখে কোমল ও উজ্জ্বল। অঙ্গে অঙ্গে জড়িয়ে রাখে আপনার প্রিয় সুরভি...আপনার ত্বকের যত্ন নেবার স্বাভাবিক উপায়!

রেক্সোনা আপনার ত্বকের পক্ষে ভালো

হিন্দুস্থান লিভার-এর একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

লিনটাস-RX.78-1812 I

ধারাবাহিক উপন্যাস
নোটোর দল ৬
লীলা মজুমদার
সম্পূর্ণ উপন্যাস
ক্যালিপসো-প্রম্বোফব ৪৮
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়
গল্প
মাছের অম্বল ১৪
সুধীন্দ্র সরকার
ছকুর ভুল ২৭
সুভদ্রকুমার সেন
হারিয়ে যাওয়া ৩০
অশোক বসু
জ্যাঠামশাইয়ের বাড়ি ৮৬
সুমন চট্টোপাধ্যায়
কবিতা ও ছড়া
তিনি ৫
শক্তি চট্টোপাধ্যায়
ফুলগুলি ২৬
সাধনা মুখোপাধ্যায়
অরণ্যপাঠ ৪১
শিবময় দাশগুপ্ত
ভ্রমণকাহিনী
থাইল্যাণ্ডে ৪৫
অসিতকুমার চৌধুরী
স্মৃতিকথা
ব্যাটে-বলে ১৯
পঙ্কজ রায়
কিশোর-ক্লাসিক
সুইস ফ্যামিলি রবিনসন ৭৫
ভাষান্তর : শেখর বসু
খেলাধুলো
হকিতে ভারতের ভরাডুবি ৮৪
মণি শর্মা
'নো'-বলে জয় ৮৫
দিলীপ দত্ত
তাছাড়া কমিক্স ও
অন্যান্য আকর্ষণ
প্রচ্ছদ : অনুপ রায়

কোথায় যেন শিউলি ফুটছে,
ছুটছে বাতাস কাশের বনে,
পূর্ণিমাতে কোথায় উঠছে
টলমলে চাঁদ নীল গগনে,
আশ্বিনে আজ সেই পৃথিবীর
চিত্র মনশ্চক্ষে ভাসে,
হারিয়ে যাওয়ার জন্যে অধীর
চিত্ত এখন সেই আকাশে।

৪ আশ্বিন ১৩৯০ ২১ সেপ্টেম্বর ১৯৮৩ ৯ বর্ষ ১২ সংখ্যা

সম্পাদক : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বাপ্পাদিত্য রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড পি ২৪৮ সি আই টি রোড, কলকাতা ৭০০০৫৪ থেকে মুদ্রিত। দাম দু'টাকা পঞ্চাশ পয়সা। বিমান মাশুল : ত্রিপুরা ১০ পয়সা। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যে ১৫ পয়সা। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য পত্রিকা

তোমাদের মনের মতো রঙিন পূজাবার্ষিকী

উপন্যাস

সত্যজিৎ রায়
সমরেশ বসু
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
বুদ্ধদেব গুহ
শৈলেন ঘোষ

সুবিশাল চিত্রকাহিনী

'অদৃশ্য প্রহরী'

বড়গল্প

আশাপূর্ণা দেবী
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

প্রতুলচন্দ্র গুপ্তের
বিশেষ রচনা
'ভোজ কয় যাহারে'।

শমীন্দ্রনাথের আরও
একগুচ্ছ চিঠি।

ছড়া ও কবিতা

অবনীন্দ্রনাথ, অন্নদাশঙ্কর, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, সুনির্মল বসু, প্রভাতমোহন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সন্তোষকুমার ঘোষ, মণীন্দ্র রায় ও আরও অনেকে।

গল্প

সুকুমার সেন, লীলা মজুমদার, বিমল কর সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, সমরেশ মজুমদার, অরবিন্দ গুহ, আনন্দ বাগচী, তারাপদ রায়, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, বলরাম বসাক, শেখর বসু, অজেয় রায়, সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, নবনীতা দেবসেন ও আরও অনেকে।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের
ভ্রমণকাহিনী।

পরীক্ষার্থীদের জন্য

হেড এগজামিনারদের লেখা
কী করে নম্বর বাড়াতে হয়।

খেলাধুলো, ম্যাজিক, ধাঁধা,
শব্দসন্ধান ও
আরও অজস্র আকর্ষণ।

দাম ২০.০০ টাকা
রেজিস্ট্রী ডাকে ২৩.৮০ টাকা

ফটো টাইপ সেটিং এ এবং অফসেট পদ্ধতিতে ছাপা, অনবদ্য লেখায় ঠাসা পূজাবার্ষিকী।

AHP/AM/CAS-2/41 BEN

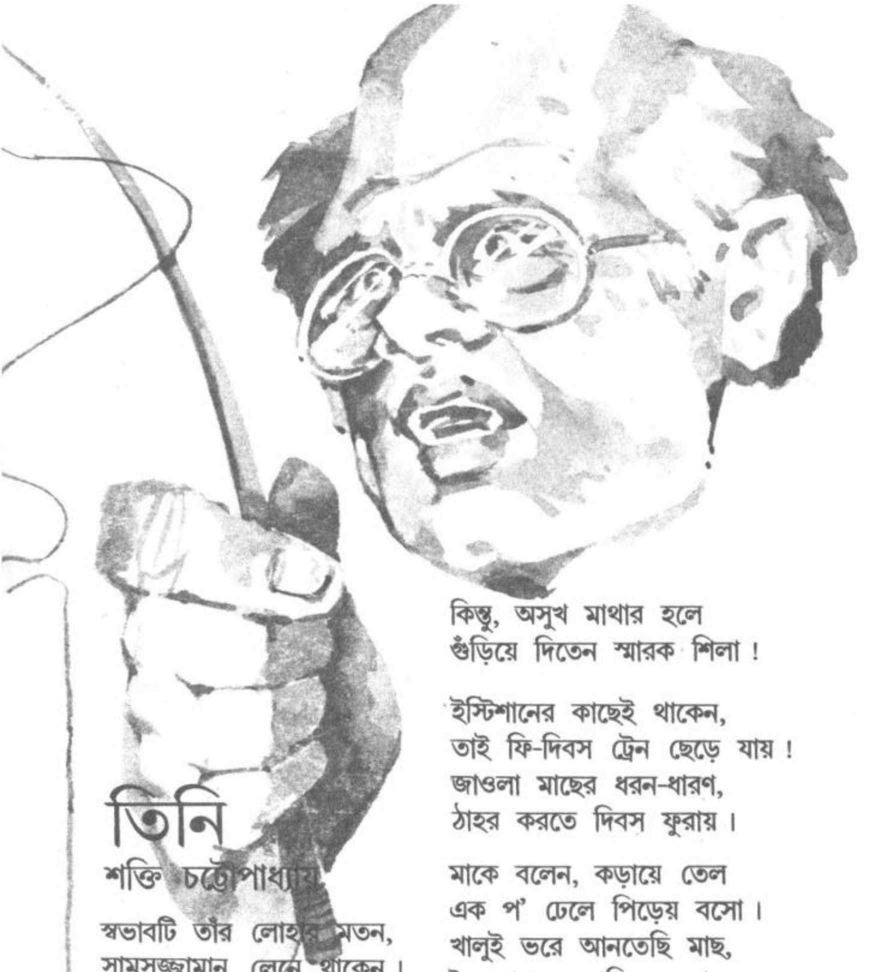

তিনি

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

স্বভাবটি তাঁর লোহার মতন,
সামসুজ্জামান লেনে থাকেন।
কোঁদল করেন নিজের সঙ্গে,
গাছপালা সব ছাঁটতে থাকেন।

মাখন পালের হিস্টোরি বুক,
অ্যালজাবরায় কে পি বসু,
এই সমস্ত শেষ করে আজ—
খুঁজতে চলেন কীসের অসুখ ?

মেড়িকা মেটেরিয়ার মধ্যে
পেটের রোগের পালসেটিলা।
কিন্তু, অসুখ মাথার হলে
গুঁড়িয়ে দিতেন স্মারক শিলা !

ইস্টিশানের কাছেই থাকেন,
তাই ফি-দিবস ট্রেন ছেড়ে যায় !
জাওলা মাছের ধরন-ধারণ,
ঠাহর করতে দিবস ফুরায়।

মাকে বলেন, কড়ায়ে তেল
এক প' ঢেলে পিড়েয় বসো।
খালুই ভরে আনতেছি মাছ,
কৈ মাগুরের বানিও রসো !

দোষ তো সবই মাছরাঙাদের
এবং মেছো বকের দাপট,
পুষ্করিণীর মধ্যিখানে
রুই-কাতলার লেজের ঝাপট !
পুঁটুলে ছিপ, হুইল তো নয়—
হুইল থাকলে বিশ্ববিজয়
করাই ছিল সহজসাধ্য !

ছবি : অনুপ রায়

ধারাবাহিক উপন্যাস

নোটোর দল

লীলা মজুমদার

বোমা একদিন এসে বলল, 'পুরনো গোয়ালটা মেরামত করেছি। ওখানে চিড়িয়াখানা করবি নাকি?' নোটো, নিমাই, মৌ, লটকান, ন্যাড়া তাই শুনে থ!

নিমাই বলল, 'কী করে করব শুনি? তুমিই তো দরজায় সারাক্ষণ তালা দিয়ে রাখো।' নোটোও রেগে গেল, 'রাখো তো খালি ধূপকাঠ, পাথুরে নুন, আঠা, হরতুকি। ও-সব কি আমরা চুরি করে খাব যে তালা দাও?'

লটকানের কী রাগ, 'মধুর ভাঁড়টে পর্যন্ত নানিকে দিয়ে দাও, হ্যাঃ! চাবির ফুটো দিয়ে আমরা সব দেখেছি। মেঝে খুঁড়ে সাফ করে রেখেছ কেন?'

বোমার নাকি ২০ বছর বয়স। বেশ বুড়ো। তাহলে কী হবে, বেশ ভিতুও আছে। ও-কথা শুনে থতমত খেয়ে গেল, 'বেশ, বাপু, তাই তো বলছি যদি চিড়িয়াখানা করো তো ঘর খুলে দিই।'

নোটোর ভারী উৎসাহ, 'বেশ হয়, না? দুঃস্থ পশু-ঘর নাম দেব।' এ-ওর দিকে চাইল পাঁচজন, সকলের চোখ চকচক করছিল। কিন্তু বোমার হঠাৎ এত উৎসাহ কেন? বোমা বলল, 'বুঝলে কিনা, তোমাদের নানি বলছিলেন ইয়ে—কী বলে—' ওরা বলল, 'কী বলে ইয়ে?'

ঠিক সেই সময় নানি ঘরে ঢুকে বলল, 'কী আবার বলব? ন্যাংড়া জানোয়ারগুলো বাড়িময় কিলবিল করে

বেড়ায়। সদাই ভয়ে ভয়ে থাকি—ঐ বুঝি কেষ্টশিং-এর বাকি শিংটাও মাড়িয়ে দিলাম। ভারী বদ জানোয়ারটা, যাই বল বাপু। বইয়ের ওপর ইয়ে করে—'

মৌ-এর কথায় কথায় ফ্যাঁচফোঁচ, 'করে তো কী হয়েছে? শুকনো, খরখরে ধুলো-ধুলো গন্ধ, তাও আমার জামা দিয়েই ঝেড়ে ফেলি—ফ্যাঁচফোঁচ!' বোমা ব্যস্ত হয়ে উঠল, 'ঠিক আছে, দিদি ঠিক আছে, অত কান্না কিসের! আমি কেমন সুন্দর খাঁচা করেছি, দেখবে এসো।'

সত্যি বোমা তালা খুলে ওদের হাতে দিয়ে দিল। ছাদের কাছে মাচা ছিল, টং ছিল। সেখানে নিজের ধূপকাঠ, আঠার বাণ্ডিল, হরতুকির ঠোঙা, বুনো তেজপাতা এইসব তুলে দিল। আর নীচে কাঠের ফ্রেম, জালের দেয়াল লাগিয়ে ছোট-বড় সারি সারি খাঁচা বানিয়ে দিল। তাতে জল রাখার মাটির ভাঁড় পর্যন্ত ছিল। খাঁচার তলায় কেরোসিন-টিনের পাত বসানো ছিল। সেগুলোর ওপর এক বালতি জল ঢেলে দিলেই সাফ। এমনকি ধোলাই করার জায়গাটাতে রোজ সার পড়ে পড়ে দিব্যি সুন্দর ফসল-টসলও হতে পারবে। দুঃস্থরা খেয়ে বাঁচবে।এইসব বলল বোমা।

আরো বলল, 'আমার কোনো জিনিসে খবরদার হাত দেবে না কিন্তু। ঐ সব বেচে আমাদের সম্‌সার চলে, তা জানো?' শুনে ওরা অবাক!

'ওমা, কী বলে! দাদু পেনসিল্ পায় মাসে মাসে এত্ত এত্ত টাকা। হরু নিজে এসে দিয়ে যায়। আর আমরা তো রোজ

"বালো বালো, শক্ত
দানার টুথ পাউডার
আপনার দাঁত ও মাড়ির
ক্ষতি করতে পারে…"

কোলগেট টুথ পাউডার দিয়ে আপনার দাঁত ও মাড়ি রক্ষা করুন – সেইসঙ্গে মুখের দুর্গন্ধও বন্ধ করুন!

কোলগেট টুথ পাউডার একেবারে মিহি আর সাদা। তাই আস্তে আস্তে মাড়ি ঘষার সময় এর ঝক্‌ঝকে করার মৃদু উপাদান দাঁতের ওপরকার ময়লা তুলে ফেলে আপনার দাঁতকে করে তোলে পরিষ্কার ধবধবে সাদা। কোলগেটের ঘন ফেনা আপনার দাঁতের ফাঁকে-ফোকরে ঢুকে দুর্গন্ধ ও ক্ষয়কারী রোগজীবাণু-গুলোকে নষ্ট করে ও মুখের দুর্গন্ধ দূর করে।

আপনার পরিবারের সকলে এই আধুনিক উপায়ে দাঁত ও মাড়ি সুরক্ষার জন্যে নিয়মিত কোলগেট টুথ পাউডার ব্যবহার করুন। পিপারমেণ্টের মত এর ঠাণ্ডা আমেজভরা স্বাদ ওদের খুবই ভাল লাগবে।

TP.G.30 BN

ইস্কুলেই আলুভাতে দিয়ে খিচুড়ি খাই। তুমি সম্সার চালাবে কেন ?'

বোমা বলল, 'আচ্ছা, আচ্ছা, তাই, তাই। কিন্তু খাঁচা-টাঁচা আমি ছোঁব না। ও-সব আমাদের করতে নেই। আমরা উঁচুজাত। তাছাড়া ও-সব ব্যাটাছেলের কাজ নয়। লটকান, মৌ—তোরা ধুবি। তোদের জাত যাবার ভয় নেই। তোদের দাদু পলটনের সঙ্গে যখন বিলেত গেছল, তখনি তোদের জাত গেছে। কিছুতেই প্রাচিত্তির করল না। রোজ একটা আস্ত মুরগি খেত। দু-আনা দাম। গোমেস চৌকিদার রেঁধে দিত। পয়সা নিত না। মুরগির ভাগ পেত। মোট কথা ময়লা-টয়লা আমি ছোঁব না। পেনসিল নিয়ে ভারী ভোল বদলে গেছে, হ্যাঁ।'

দেখতে দেখতে চিড়িয়াখানা বোঝাই হয়ে গেল। দুঃস্থ পশুঘর থেকে কাউকে ফিরিয়ে দেওয়া হয় না। যারা অন্য কোথাও আদর পায় না, তারাই এখানে যত্ন পায়। তাদের রসদ কিনবার জন্য নানি তার লুকোনো হাঁড়ি থেকে প্রতি হপ্তায় ১ টাকা দিত আর ওদের বলত, 'তোরাও চাঁদা দিস!' ও মা, ওরা আবার পয়সা কোথায় পাবে! নানি বলল, 'নিজেদের খাবার থেকে একটু করে দিস, তাহলেই হবে। অমনি না করলে ভালবাসা জন্মাবে কেন ?'

বোমা বলল, 'ঠিক তাই। আমি দোক্তা খাবার সময় তার ওপর মাছি বসে। আমি কিচ্ছু বলি না। নইলে ওরা আমাকে ভালবাসবে কেন ?' নানি যা বলে, বোমা সর্বদা বলে, 'হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক তাই।' ও ঐরকম।

এখন পশু-ঘরে বেজায় ভিড়। কেষ্টশিং বলে শিং-ভাঙা গুবরে। মাজা-ভাঙা সবুজ সাপ। হাঁটু-মচকানো হাড়গিলে। কানা কচ্ছপ। বদমেজাজি বেজি ; তাকে এক মিনিটের জন্যেও ছাড়া যেত না। কামড়েটামড়ে একাকার! জাঁতাকলে ঠ্যাং-কাটা সাদা শেয়াল। একটা বুড়ো ভালুকও ছিল। কোনো খাঁচায় তাকে আঁটত না। অনেক রাতে আসত সে, পাছে নানি দেখলে ভয় পায়। বোমা দরজা খুলে দিত। আবার ভোরে কেউ উঠবার আগে বনে চলে যেত। রাতে নাকি বোমার গা ঘেঁষে শুয়ে, বোমার কাঁথার অর্ধেকটা গায়ে দিয়েও ঠকঠক করে কাঁপত। তার নাম বালু। বোমা তাকে বড্ড ভালবাসত।

এর মধ্যে পরিবন থেকে এক বেচারা কালো মুরগিছানাকে ঠোকরাতে ঠোকরাতে একটা ঝগড়াটে লাল মোরগ বেরিয়ে এল। তাদেরই বা ফেরানো যায় কী করে ? আলাদা আলাদা খাঁচা করে দিল বোমা। পাশের বাড়িতে ভুলুরা থাকত। অনেকটা দূরে দূরে পরিবনের ধারের বাড়ি ঘর। গাঁয়ের লোকে এখানে আসতে ভয় পায়। পরিবন জায়গা নাকি ভাল না। সেদিন ভুলুর দিদিমা নানির কাছে বাতের ওষুধ নিতে এসেছিলেন। বললেন, 'ও-সব সত্যি জানোয়ার ভেবেছ নাকি, দিদি ? সব মায়া-জন্তু। এখানে ঘর তুলতেই মানা করেছিলাম, তা বটঠাকুর শুনলেন না। বিনি পয়সায় দিচ্ছে তো কী হয়েছে ? ভাল জায়গা হলে মিনিমাগনা দিত নাকি গবরমেণ্ট ? ভাল কথা বলছি, কিছু হবার আগে ঐগুলোকে বিদেয় কর। ওমা, ও আবার কী হল ?'

নোটো নিমাই মৌ ন্যাড়া লটকান গোয়ালঘরে তালা দিয়ে তার সামনে সারি-সারি দাঁড়িয়ে গেছিল। মৌ বলল, 'কী করে অমন বলছ দিদিমা ? দুঃস্থ পশুঘরের দুঃখী জানোয়ারদের বের করে

দেব ? কে ওদের খেতে দেবে, চিকিচ্ছে করবে। গোবরের গুলি খেয়ে খেয়ে কেষ্টশিং কেমন দিনে দিনে বাড়ছে দেখছ না ? গা চকচক করে। নোটোদা তেল-ন্যাকড়া দিয়ে সাফ করে।'

লটকান বলল, 'তাছাড়া ছাড়লেই আর দেখতে হবে না। ওরা অমনি এ-ওকে গিলে বসে থাকবে।' দিদিমা তো হাঁ ! শেষটা বিড় বিড় করতে করতে ওষুধ নিয়ে বাড়ি চলে গেলেন। নানি বলল, 'তেল-ন্যাকড়াটা কি আমার রান্নাঘরের কড়াই মোছারটা নাকি ?' নোটো সট্‌কান দিল।

তখন নানিকে ওরা চেপে ধরল, 'দিদিমাকে কিচ্ছু বললে না তুমি ? জানো, বড় মোরগের ঝুঁটি কাটা ? দুঃখী ! ওকে ফেলে দেব ?' এইখানে ন্যাড়া ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলাতে নানি ওদের সবাইকে

চিড়ের মোয়া খেতে দিল। বলা বাহুল্য দুঃস্থরাও তার ভাগ পেল। এইরকম শত শত্তুরের কাছ থেকে বেচারিদের রক্ষা করতে হত। নানিও আসলে ওদের পছন্দ করত না। কিন্তু পশুঘর তুলে দিলে ওরা পাঁচজন যে অবসর সময় পরিবনে আর দুঃস্থরা বাড়িময় ঘুরে বেড়াবে, তাতে নানির মনে কোনো সন্দেহই ছিল না।

নানি ওদের বার বার বলত, 'যত খুশি জীবজন্তু পোষ্ বাছা; কিন্তু বনের মধ্যে যাবি না। ও বড় ভয়ংকর জায়গা। কেউ ফেরে না ওখান থেকে।'

নিমাই বলল, 'বোমা তো রোজ যায়।' নানি চটে গেল, 'বোমা যাবে না তো কী ? ওর যে সরকারি পারমিট আছে। তোরা খবরদার যাবি না। গেলে আর তোদের দেখতে পাব না।' এই বলে নানি সত্যি সত্যি খানিকটা কেঁদে নিল। তারপর চোখ মুছে বলল, 'বন কেমন বোমাকেই জিগেস করিস।'

তাই করেছিল। বোমার কী রাগ ! 'আমি আবার কী জানি ? অঙ্কই কষতে পারি না, তা আবার বলবটা কী ? পারলে তো সকলের মতো পল্টনেই ঢুকতাম। তবে এই বনে পরিদের উপদ্রব। তার পরেই আসল ঘন বন। সেখানে যে যায় তাকেই মিলিটারিরা গুলি করে মেরে ফেলে। যারা পালিয়ে বাঁচে, বাঘ-ভালুকরা তাদের খেয়ে ফেলে। সোঁদরবন খুব দূরে নয়। ঘন বনের পর চোরা কাদা। একটা পাতা পলেও ডুবে যায়। কাদায় শুষে নেয়। যদি বা কপালজোরে কাদার মধ্যে শুকনো ডাঙার হদিস পাস, তার পরেই জগৎ-জলা। তাতে তিনমানুষ জল। জলে কুমির থিকথিক করছে। সব মাছ-কচ্ছপ শেষ করে তারা এখন এ-ওকে খেয়ে বাঁচে।

তাতে সংখ্যায় বেশি বাড়তে পারে না। নইলে দেশের এই দিকটা মস্ত একটা কুমিরহাটা হয়ে পড়ত। এই যে প্রাণ দিয়ে দুঃস্থ পুষছ, তোমাদের কিছু হলে এরা কেউ একদিনও বাঁচবে না। বালুও না।'

এই বলে বোমা উঠে পড়ল। ওদের বনে যাবার ইচ্ছেটা খুব কমে গেল। যদিও বোমাই বন থেকে কী ভাল আঁশফল, বেতগোটা, বুনো আখ, এই সব নিয়ে আসত। ভুলুর দাদু ইস্কুলমাস্টার। ওদের বাড়ির পাশেই স্কুলবাড়ি। ওরা পাঁচজনেও সেখানে পড়ে। ওদের বয়স ৫, ৭, ৭, ৭১/২, ৮। সবার নীচের ক্লাসে ন্যাড়া। সে কাঠি দিয়ে মাটির ওপর আঁকা অ-আ-তে দাগা বুলোয়। দাগা বুলোয় আর চারদিকে কানা কচ্ছপের, বদমেজাজি বেজির, মাজা-ভাঙা ময়াল সাপের, হাঁটু-মচকানো হাড়গিলের ছবি আঁকে। কী ভাল দেখায়! দুই ক্লাস ওপরে মৌ আর লটকান যোগ-বিয়োগ কষে। ন্যাকড়ায় মোটা ছুঁচ দিয়ে ফোঁড় তোলে। আরেক ক্লাস ওপরে নোটো নিমাই ভূগোল পড়ে। সবাই ছবি আঁকে। সবাই ডন-বৈঠক করে। গায়ে খুব জোর হলে আর বেশ খানিকটা লেখাপড়া শিখলে, মনে সাহস হয়। বড় মাস্টারমশাই বলেছেন। ওরা তখন মোটা মোটা বাঁশের লাঠিতে তেল মাখিয়ে হাতে নিয়ে, পরিবনে গিয়ে মা-বাবাদের খুঁজে নিয়ে আসবে। পরিরা যদি তাদের হরিণ বানিয়ে দিয়ে থাকে, তাহলে পণ্ডিতমশায়ের গঙ্গাজলের ঘড়া থেকে একটু জল ঢেলে নিয়ে যাবে। সে জল ছিটোলে নাকি হরিণ কেন, পাপীতাপীরাও মানুষ হয়ে যায়। পণ্ডিতমশায়ের দিদি বলেছেন। তবে এ-সব কথা ওরা নানিকে বলে না। নানির হয়তো দুঃখ হবে। দাদুকে তো কোনো

কথাই বলা হয় না। দাদুর সিন্দুকে নাকি এখনো বন্দুক আছে। দাদু যখন মিলিংটারিতে ছিল, তখন পেয়েছিল। তার লাইসেন-ও আছে। যেমন করে হোক, সেটা সঙ্গে নিতে হবে। খালি-হাতে ও-সব বিপজ্জনক জায়গায় না যাওয়াই ভাল। তবে দাদু বেজায় রাগী। বন্দুকটা না বলেই নিতে হবে।

এর মধ্যে একদিন ঝড় উঠেছিল। একটা কাগের বাসা পাঁচটা ন্যাড়া ছানাসুদ্ধ উড়ে ওদের উঠোনে পড়েছিল। ছানাগুলো বাঁচল না। তাই দেখে নানি কেঁদেকেটে একাকার। সে-রাত্রে ওরা পাঁচজনে নানির বিছানায় ঘেঁষাঘেঁষি করে শুয়েছিল। নানি কাঁদলে ওদেরও কান্না পায়।

(ক্রমশ)

ছবি : দেবাশিস দেব

সব চেয়ে সুস্বাদু জলখাবার তৈরীর উন্নততর স্বাদিষ্ট পন্থা

নতুন!

MAGGI®

2-মিনিট নুডলস্

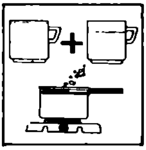

1. মাত্র দেড় কাপ জল ঢালুন এবং ফোটান

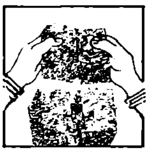

2. নুডলসকে চারটি ভাগে ভাগ ক'রে নিন

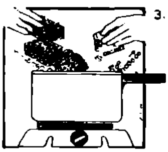

3. ফুটন্ত জলে নুডলস ফেলে দিন টেষ্ট-মেকার সমেত

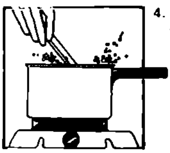

4. মাত্র মিনিট দুই ফুটতে দিন, মাঝে-মাঝে নাড়িয়ে দিন।

গরম পরিবেশন করুন স্বাদে অপূর্ব।

আপনি এই সহজ পদ্ধতিগুলি যখনই কাজে লাগাবেন তখনই কিন্তু ম্যাগি 2-মিনিট নুডলসের অপূর্ব স্বাদে আপনি রূপায়িত করাবেন।

ম্যাগি—এর একান্ত নিজস্ব বিশেষ টেষ্ট-মেকার রয়েছে, তিনটি চমৎকার সুগন্ধে—মসলা, চিকেন ও ক্যাপসিকা।
ম্যাগি—সর্বোচ্চ গুনমানের এবং ইতিপূর্বে বিরল সুস্বাদু রেঞ্জ।

নীট ওজন
100 গ্রাম

CLARION/141R BEN

রান্না হয় তাড়াতাড়ি! খেতে লাগে মজাদারী!

বিজ্ঞানবিচিত্রা

অসুখের গন্ধ

এবার গন্ধ শুঁকে রোগ ধরার সময় আসছে। অনেকদিন আগে থেকেই জানা ছিল যে, অসুখের সময় মানুষের গায়ের গন্ধ পাল্‌টে যায়। তাছাড়া, এক-এক রকম অসুখের এক একরকম গন্ধ। যেমন, প্লেগ হলে মধুর গন্ধ, হাম হলে গরম রুটির গন্ধ, বসন্ত হলে সদ্য-ছেঁড়া পাখির পালকের গন্ধ এবং পাগল হয়ে গেলে ইঁদুর বা হরিণের গায়ের গন্ধ বার হয়। অবশ্য শরীরের কোন্‌ জায়গাটা কতক্ষণ শুঁকতে হবে তার ওপর নির্ভর করছে অসুখটা ধরা যাবে কি না। শুনতে যতই অদ্ভুত হোক না কেন, এ নিয়ে জোর গবেষণা চালাচ্ছেন জর্জটাউন্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ রবার্ট হেন্‌কিন।

আসলে, আমাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয় বায়ুতে ভাসমান বস্তুকণার সংযোগে উত্তেজিত হয়। এক-একরকম উত্তেজনায় আমরা এক-একরকম গন্ধ পাই। অসুখ করলে শরীরে নানারকম রাসায়নিক পরিবর্তন হবেই, ফলে শরীর থেকে বেরিয়ে আসা বস্তুকণারও বদল হবে। তাই, তার গন্ধও যে বদলে যাবে তাতে আর আশ্চর্য কী!

কোলাহল চুপ

যেসব বড় রাস্তায় খুব বেশি গাড়ি আর লোকজন যাতায়াত করে সে রাস্তায় এত আওয়াজ ও কোলাহল হয় যে ওখানকার বাসিন্দারা তো বিরক্ত হয়ে উঠবেনই! বিরক্তিকর শব্দ সবসময় শুনলে তা আমাদের শরীর ও মনের বেশ ক্ষতি করে, তা প্রমাণ করেছেন পরিবেশ-বিজ্ঞানীরা। সম্প্রতি ইংল্যাণ্ডের ব্র্যাড্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জিনেট ব্রুক্‌স একটা মজার সমাধান আবিষ্কার করেছেন।

তিনি জানিয়েছেন যে, শব্দকে প্রতিহত করার ক্ষমতা গাছের খুব বেশি। সিমেন্টের পাঁচিল তুলে দিলে শব্দ যত কম আসবে তার চেয়ে বহু গুণ কম শব্দ বাড়িতে ঢুকবে যদি বাড়ির চারপাশে ঘন করে গাছের সারি লাগানো যায়। তার ওপর গাছের পাতা যদি খুব বড়-বড় হয় তাহলে তো সোনায় সোহাগা। অবশ্য, সব গাছের শব্দ আটকানোর ক্ষমতা সমান নয়।

চঞ্চল পাল

মাছের অম্বল

সুধীন্দ্র সরকার

টুয়া যা দেখে তাই কিনে দিতে বলে ওর বাবাকে। রাস্তায় বেলুন দেখলে বেলুন। মোটরগাড়ি দেখলে মোটরগাড়ি। ওর তিন বছর বয়সে পুরী বেড়াতে গিয়ে সমুদ্র দেখে বাবাকে বলেছিল, "বাবা, আমাকে একটা সমুদ্র কিনে দেবে?" বাবা যদিও টুয়ার বায়নামতো এটা-সেটা কিনে দেন, কিন্তু সমুদ্র কী করে দেবেন! তাই, তার বদলে একটা অ্যাকোয়ারিয়াম এনেছিলেন বাড়িতে।

এই বছর ক্লাস থ্রিতে উঠল ও। পড়াশোনার চাপের কাছে বায়নার মাত্রাটা একটু কমে গেছে এখন। নতুন ক্লাসের নতুন বই। তার ওপর, হোমটাস্কের চাপ তো আছেই।

কয়েকদিন হল, একটা বেড়াল ওদের বাড়িতে আসা-যাওয়া করতে শুরু করেছে। বেড়ালটা রান্নাঘরে উঁকিঝুঁকি মারে। এদিক-সেদিক লুকিয়ে থেকে লক্ষ করে কোথায় খাবার-টাবার আছে। কখনও আবার আলমারির নীচে চার-পা মুড়ে পাশ ফিরে শুয়ে থাকে।

দিন-সাতেক আগে টুয়া ওর বাবাকে একটা বেড়াল এনে দিতে বলেছিল। বাবা আনেননি। তার ওপরে মায়ের মানা তো ছিলই। কিন্তু ছোট্ট বেড়ালটা নিজে থেকে বাড়িতে এসে পড়ার ফলে বাবা কিংবা মা কেউই ওকে তাড়াননি। বাড়িতে বেড়াল ঢোকার জন্যে আপত্তিও করেননি।

বেড়ালটার সঙ্গে খুব ভাব হয়ে গেছে টুয়ার। ওর গায়ে হাত দেয় না বটে, তবে নিজের খাবার থেকে এটা-সেটা ছুঁড়ে দেয় খেতে। আর একটা নামও ঠিক করে ফেলেছে ওর জন্যে। 'তুতি' বলে ডাকলেই ম্যাঁও বলে সাড়া দেয় বেড়ালটা। বাবাও বোধহয় ওকে ভালবাসেন। নইলে, তুতি বাবাকে দেখলে ভয়ে পালায় না কেন? যেমন মাকে দেখলে ত্রিসীমানায় থাকে না।

রবিবারে বাবা মস্ত বড় একটা ইলিশ মাছ কিনে আনলেন। তুতি মাছের গন্ধ পেয়ে উঁকি মারছিল রান্নাঘরের জানলায়। রান্নাঘরের ওই জানলার ঠিক নীচেই গ্যাসের উনুন। উনুনে আঁচ গনগন করছিল তখন। টুয়া ভাবল, তুতি যদি মাছ খাওয়ার লোভে রান্নাঘরে লাফ মারতে গিয়ে উনুনে পড়ে! কিন্তু, মাছ তো রান্নাঘরে নেই। তুতি জানলায় বসে আছে কেন তবে? আন্নার মা উঠোনে বসে মাছ কুটছিল। তুতিকে রান্নাঘরের জানলা থেকে তাড়িয়ে দেবে নাকি? কিন্তু, ঘরের ভেতর মা থাকাতে সে সাহস হল না টুয়ার। মা আলমারি খুলে কী সব করছিলেন।

একটু পরে আন্নার মা মাছ ধুয়ে নিয়ে

রান্নাঘরে ঢুকতেই চোখের নিমেষে তুতি জানলা থেকে সরে গেল। পালিয়ে গেল বাগানের দিকে। টুয়াও বাঁচল হাঁফ ছেড়ে।

আজ বাবার অফিস ছুটি। টুয়ারও স্কুল নেই। বাবা কী একটা জিনিস কিনতে বাইরে বেরুচ্ছিলেন।

টুয়া অভ্যেসমতো বাবাকে বলল, "বাবা, আমাকে একটা মাছ কিনে দেবে?"

"মাছ? মাছ তো এনেছি। আন্নার মা রাঁধছে।"

"ওটা তো রান্নার জন্যে। আমার নিজের জন্যে বলছি।"

"অ্যাকোয়ারিয়ামে তোমার কত মাছ আছে। তলোয়ারের মতো লেজঅলা সোর্ডটেল, চাঁদের মতো গোল অ্যাঞ্জেল, গলায় টাই-ঝোলানো যুদ্ধবাজ ফাইটার, বাঘের মতো—"

"টুয়া!" মা ধমকে উঠলেন কথার মাঝে, "সবসময় বায়না!"

মুখ ভার হল টুয়ার। চোখদুটো ছলছল করে বলল, "আমি তো পুতুলের রান্নার জন্যে মাছ আনতে বলছিলুম। বাবা তো বলেছেন, অ্যাকোয়ারিয়ামের মাছ খায় না।"

"ওহ! আমার তো সে কথা একেবারেই মনে ছিল না। ঠিক আছে দেখছি, পুতুলের রান্নার জন্যে মাছ বাজারে পাই কি না।" বাবা হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেলেন।

মায়ের চেয়ে বাবা ভাল। কেমন কথা শোনেন। টুয়া যখনি যা চায়, তাই এনে দেন। আর, মায়ের কাছে কিছু চাইলেই অমনি বকাবকি।

কড়াতে মাছ চাপাল আন্নার মা। তুতি কোথায় লুকিয়ে আছে কে জানে? সারা বাড়ি 'ম-ম' করছিল ইলিশভাজার গন্ধে।

একটু পরেই বাড়ি ফিরলেন বাবা। "টুয়া তোমার মাছ এনেছি।" বলতে বলতে ঢুকলেন ঘরে।

টুয়া ছুটে এল বাবার কাছে।

"অনেক দোকান খুঁজে তবে পেলাম। এসব মাছ আর আজকাল বেশি দেখা যায় না।" বাবার হাতে একটা রঙচঙে লজেন্স-মাছ। বেশ বড়সড়। আকারে পারশে মাছের মতো। রঙিন মাছটা বাবা টুয়ার হাতে দিয়ে বললেন, "কামড়ে দেখ কী মিষ্টি।"

"কাঁচা মাছ কী কেউ খায় নাকি? মাছ তো রান্না করে খেতে হয়।" ঠোঁট উলটে টুয়া বলল, "তুমি কিচ্ছু জানো না।"

"এটা তো লজেন্স-মাছ। ছোটদের জন্যে। কাঁচাই খেয়ে দেখো না একবার।" বলেই বাবা স্নান করতে চলে গেলেন।

টুয়া লজেন্স-মাছটা মুখে দিয়ে চুষতে লাগল। সত্যি, কী সুন্দর! টক-টক মিষ্টি-মিষ্টি মাছটা!

ঠিক তখনি তুতি জানলা গলে ঝুপ করে লাফ দিয়ে ঘরে ঢুকল। চমকে উঠল টুয়া। তুতি মিটমিট করে দেখছিল আর লেজ নাড়ছিল। টুয়া পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল তুতির কাছে। তুতির জন্যে খুব কষ্ট হয় ওর। আস্ত মাছ খেতে পায় না কোনোদিন। মাঝে-মধ্যে এঁটো বাসন থেকে কাঁটা-টাটা খায়।

টুয়া এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখল। বাবা মা দুজনের কেউই ধারে-কাছে নেই। লজেন্স-মাছটা তুতির দিকে বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করল ফিসফিস করে, "তুতি, আস্ত মাছ খাবি? খেয়ে দেখ কী সুন্দর, টক-টক মিষ্টি-মিষ্টি!"

মিয়াঁও করে তুতি ডেকে উঠল।

তুতি কী বলল, আর টুয়া কী বুঝল কে জানে। লজেন্স-মাছটা টুয়া ওর মুখের সামনে ছুঁড়ে দিতেই, তুতি ওটা মাটি থেকে মুখে নিয়েই এক লাফে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

টুয়া কিছুক্ষণ বোকার মতো চেয়ে রইল দরজার দিকে। তারপর দৌড়ে গেল কয়েক পা। এদিকে লজেন্স-মাছটা মুখে নিয়ে তুতি উঠোন পেরিয়ে রান্নাঘরের জানলা টপকে

ভেতরে লাফ দিয়েছে। তুতির কাণ্ড দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল টুয়া। ওই জানলার নীচেই গ্যাসের উনুন জ্বলছে। বুক ঢিপ-ঢিপ করে উঠল ওর। তুতি যদি উনুনের ওপরে লাফ দেয়!

হতাশ হয়ে ও বসে পড়ল চেয়ারের ওপরে। একদৃষ্টে চেয়ে রইল রান্নাঘরের দরজার দিকে। মনে-মনে ভগবানকে ডাকছিল, তুতির যেন কিছু না হয়। ও যেন সুস্থ থাকে।

হঠাৎ চোখদুটো চকচক করে উঠল টুয়ার। তুতি পোঁ করে দৌড়ে বেরিয়ে এল রান্নাঘর থেকে। ওর পেছনে আন্নার মা। হাতে খুন্তি। টুয়া ছুটে উঠোনে এল। তুতিকে ও ভাল করে দেখতে পর্যন্ত পেল না। আন্নার মায়ের তাড়া খেয়ে একলাফে পাঁচিল টপকে অদৃশ্য হয়ে গেল তুতি।

তুতিটা অমন করে পালিয়ে গেল কেন? আন্নার মা কি ওকে খুন্তি-পেটা করেছে। দাঁড়াও, বাবাকে দিয়ে আন্নার মাকে বকুনি খাওয়াবে টুয়া। শুধু-শুধু তুতিকে মারবে কেন?

দুপুরে বাবার সঙ্গে খেতে বসেছিল টুয়া। ডাল আর মাছভাজা খাওয়ার পর মাছের ঝোলে ভাত মেখে তুলতেই মুখ বিকৃত করে উঠলেন বাবা, "এটা কি ইলিশ মাছের ঝোল? থুঃ।" বাবা রেগে আগুন। জিজ্ঞেস করলেন মাকে, "আন্নার মা কোথায়?"

"ওর কোন্ আত্মীয়ার বাড়ি গেছে। রাত্রে আসবে।" মা মাছের ঝোল চেখেই ভুরু দুটো কুঁচকে ফেললেন, "মাছের ঝোল, না মাছের অম্বল? অ্যাঁ! কী টক-মিষ্টি স্বাদ!"

মাছের ঝোল খাওয়া হল না বটে, কিন্তু টুয়ার খুব আনন্দ হল। ওকে আর বাবার কাছে আন্নার মায়ের নামে নালিশ করতে হল না। রাত্রে যখন আন্নার মা ফিরবে বাবা নিজেই বকবেন।

তুতিকে খুন্তি-পেটার শাস্তি। ঠিক হয়েছে! কেমন অন্যরকম হয়ে গেছে মাছের ঝোল।

সেদিন আর তৃপ্তি করে মাছ খাওয়া হল না। শুধু ভাজা খেয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হল সবাইকে। বাবা গজগজ করছিলেন রাগে। মা মাছের ঝোলের কড়াটা উপুড় করে দিলেন উঠোনের নর্দমায়।

টুয়া উঠোনে মায়ের কাছে গেল।

মা ঢং করে উঠোনে কড়াটা রেখে জিজ্ঞেস করলেন, "বেড়ালটা কোথায় রে? এতগুলো মাছ ফেলে দিলাম, অথচ বেড়ালটারই পাত্তা নেই।"

টুয়া কোনো উত্তর দিল না।

দুপুরে মা ঘুমচ্ছিলেন। টুয়া দম দেওয়া টয়-ট্রেনটা নিয়ে মেঝেতে বসে খেলা করছিল। হঠাৎ বেড়ালের মিঁয়াও ডাক শুনে ধড়ফড় করে উঠে পড়ল ও। উঠোনে এসে টুয়া দেখল, তুতি কখন চুপি-চুপি এসে মাছগুলোকে নর্দমা থেকে খেয়ে ফেলছে চেটেপুটে।

ও পায়ে পায়ে তুতির কাছে গেল। মাছগুলো শেষ করে তুতি তখন কড়া চাটতে শুরু করেছিল। কড়ার দিকে চোখ পড়তেই চোখদুটো গোল-গোল হয়ে গেল টুয়ার! চমকে উঠল ও। সেই লজেন্স-মাছটা না? সকালে বাবা যেটা কিনে এনেছিলেন। টক-টক! মিষ্টি-মিষ্টি! তুতি লজেন্স-মাছটা নিয়ে রান্নাঘরের জানলা টপকাতে যাওয়ার সময় নিশ্চয়ই ওটা ওর মুখ থেকে মাছের ঝোলে পড়ে গিয়েছিল। আর যার ফলে, মাছের ঝোল হয়ে গিয়েছিল বিস্বাদ। ইশ্! লজেন্স-মাছটা গলে গিয়ে অ্যাকোয়ারিয়ামের গাপ্পি মাছের মতো ছোট্ট হয়ে গেছে। মাছের ঝোলের সঙ্গে লেপটে আছে কড়াতে। টুয়া কড়া থেকে লজেন্স-মাছটা তুলে ফেলে দিল বাগানে। তুতি ডেকে উঠল, মিঁয়াও।

ছবি: অনুপ রায়

ফ্ল্যাশ গর্ডন

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

ব্যাটে-বলে

পঙ্কজ রায়

॥ ৩ ॥

দিল্লিতে প্রথম টেস্টে আমরা হয়তো জিততে পারতাম যদি না বিজয় হাজারে গোঁয়ারতুমি করতেন। তখন হাজারে আর মার্চেন্টের মধ্যে একটা রেষারেষি চলত। ভারতের ব্যাটসম্যানদের মধ্যে 'আমিই শ্রেষ্ঠ' বলে প্রমাণ করার জন্য তাঁরা তুমুল প্রতিযোগিতা চালিয়ে যেতেন। কী প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা যে চলত, তোমাদের বলে বোঝাতে পারব না। হাজারে ও মার্চেন্ট, দুজনেই প্রচণ্ড চেষ্টা করতেন একে অপরের চেয়ে বেশি রান করার। তাতে টিমের কী হল না হল সেদিকে বিশেষ নজর দিতেন না। দিল্লিতে প্রথম ম্যাচে জিতবার যে সুযোগ ছিল, তা এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার কবলে পড়ে নষ্ট হয়েছিল। আগেই বলেছি, দিল্লিতে মার্চেন্ট ১৫৪ রান করেছিলেন। হাজারে প্রতিজ্ঞা নিয়েছিলেন তার চেয়েও বেশি রান করার, এবং ধীরে ধীরে নিজের ইনিংস গড়তে লাগলেন। থামলেন গিয়ে ১৬৪ রানের মাথায়। ভারত ছয় উইকেটে ৪১৮ রানে প্রথম ইনিংস ডিক্লেয়ার করে দিল মোট আড়াই দিন খেলে। অথচ স্কোর এতদূর টেনে নিয়ে যাওয়ার দরকার ছিল না।

ইংল্যাণ্ড প্রথম দফায় করেছিল ২০৩ রান। দেড়শো রানে এগিয়ে থেকে অনায়াসে দান ছেড়ে দেওয়া যেত। হাজারে ছাড়লেন না কিছুতেই। মার্চেন্টের থেকে বেশি রান করার জন্য তিনি ব্যাট করে গেলেন। বেশি রান করলেন বটে, কিন্তু আখেরে লাভ হল এই যে, ইংল্যাণ্ড সম্ভাব্য পরাজয়ের হাত থেকে বেঁচে গেল। প্রথম ইনিংসের মতো দ্বিতীয় ইনিংসেও অসাধারণ বোলিং করে মাঁকড় ইংল্যাণ্ডকে বেকায়দায় ফেলে দিয়েছিলেন। কিন্তু হলে কী হবে, পাঁচ দিনের মেয়াদ তো তখন ফুরিয়ে এসেছে। আর সময় নেই। তাছাড়া, ইংল্যাণ্ডকে হারের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন আরও একজন—অ্যালান ওয়াটকিন্স। বাঁ-হাতি ওয়াটকিন্স দীর্ঘ ন' ঘণ্টা ব্যাট করে দলের পতনকে রোধ করেছিলেন। পঞ্চম দিনে ইংল্যাণ্ডকে সমূহ বিপদ থেকে টেনে তুলে তিনি যখন প্যাভেলিয়নে ফিরলেন, তখন তাঁর স্কোর—অপরাজিত ১৩৭। সেঞ্চুরি তেমন আকর্ষণীয় হয়নি, কিন্তু যেভাবে মাটি কামড়ে পড়ে থেকে তিনি ম্যাচ বাঁচিয়েছিলেন তা আমি কখনও ভুলতে পারব না। তাঁর সঙ্গী হিসেবে দেওয়ালে পিঠ রেখে লড়াই করেছিলেন আরও দুজন—এফ এ লোসন এবং ডোনাল্ড কার। ইংল্যাণ্ডকে হারের হাত থেকে বাঁচাতে এঁরাও প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন। সে-ম্যাচে আমাদের ফিল্ডিং খুব খারাপ হয়েছিল। আমার মতো সেবার প্রথম টেস্ট খেলার সুযোগ পেয়েছিলেন উইকেটরক্ষক নানা যোশি।

আমেলা—২ (২১· ৯· ৮৩)

আপনার আদরের মেয়েটিকে
দিন উপহার, ক্যালামাইন-এর দীপ্তিময় রঙের বাহার!
৩টি সাইজে পাওয়া যায় ৩৫, ৭০ ও ১২০ মি. লি.
এই বাড়ন্ত বয়েস, আর এই ফোটাফুলের
মত তরুণ মুখগুলি—তার জন্যে দরকার—একটু
বিশেষ ধরণের যত্নের ছোঁয়ার। পণ্ডস্
ক্যালামাইন—আজকের মেয়েদের জন্যেই।
এর শীতল আরামদায়ক পরশ ওদের
মুখগুলিকে ফুলের মত তাজা আর সৌন্দর্যের
দীপ্তিতে ভরিয়ে রাখে। এ হ'ল এমন এক
সৌন্দর্য্য প্রসাধন, যা দিয়ে প্রতি মা-ই
চান তাঁদের মেয়েদের সৌন্দর্য্যে চমক আনতে
পণ্ডস্
ক্যালামাইন
মেয়েদের প্রথম প্রসাধন
PONDS
Calamine
Lotion
LINTAS(M) PIL-PCL-7-1610-BG

যোশি প্রথম ইনিংসে মন্দ খেলেননি, কিন্তু দ্বিতীয় ইনিংসে যা করলেন তাকে 'অতি বাজে' ছাড়া আর কোনো বিশেষণ দেওয়া যায় না। জঘন্য খেললেন, গণ্ডায়-গণ্ডায় ক্যাচ ফসকাল। তার মধ্যে দুটি ক্যাচ ছিল নেহাতই সহজ। ডি কে গায়কোয়াড়ের মতো ফিল্ডারও একেবারে বাজে ফিল্ডিং করলেন। মার্চেণ্টের জায়গায় ফিল্ডিং করতে নেমেছিলেন তিনি। লোপ্‌পা ক্যাচ ফসকালেন। তখনই বুঝেছিলাম, এ-ম্যাচ আমরা জিততে পারব না। এত ক্যাচ মিস করলে খেলায় জেতা যায় কখনও ? ভিনু প্রথম দফায় তিনটে উইকেট পেয়েছিলেন। পরের দফায় ছয় উইকেটের মধ্যে একা হাতিয়েছিলেন চারটি উইকেট। খেলা শেষ হওয়ার পর চটে গিয়ে মাঁকড় বলেছিলেন, "এমন করে ক্যাচ ফসকালে তোমাদের কেউ জেতাতে পারবে না।"

কানপুরের গ্রিন পার্কে আমরা আট উইকেটে হারলাম। স্পিনারদের সাহায্যকারী পিচে অফস্পিনার রয় ট্যাটারসল ও বাঁ-হাতি ম্যালকম হিলটন বিপদে ফেলে দিয়েছিলেন। একশো একুশ রানে আমাদের পাততাড়ি গুটিয়ে ফেলতে হল। দলে সর্বোচ্চ রান করেছিলাম আমি, সাঁইত্রিশ। ট্যাটারসল ছটি উইকেট পেলেন। হিলটন পেলেন চারটি। ব্যাট করতে নেমে ইংল্যাণ্ডও সুবিধে করতে পারল না। গুটিয়ে গেল ২০৩ রানে। গোলাম আমেদ আর মাঁকড় চমৎকার বল করলেন। গোলাম শিকার করলেন পাঁচটি উইকেট, মাঁকড় চারটি। দ্বিতীয় ইনিংসে আমাদের অর্ধেক ধসিয়ে দিলেন ন্যাটা হিলটন। ১৫৭ রানে আমরা দ্বিতীয় দফায় ফুরিয়ে গেলাম। ফলে পঁচাত্তর রান করলে জিতবে এমন অবস্থায়, ইংল্যাণ্ড দুই উইকেট খুইয়ে প্রয়োজনীয় রান তুলে নিল। তিনদিনের মধ্যে খেল খতম।

পঞ্চম টেস্টে আমরা এর প্রতিশোধ

মাদরাজে সেঞ্চুরি। ক্যামেরার দিকে পিছন ফিরে আছেন মুস্তাক

পি· সেন (দারুণ উইকেটকিপিং)

সেই পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর অনুভূতির জন্য...

লাইফবয় পার্সোনাল

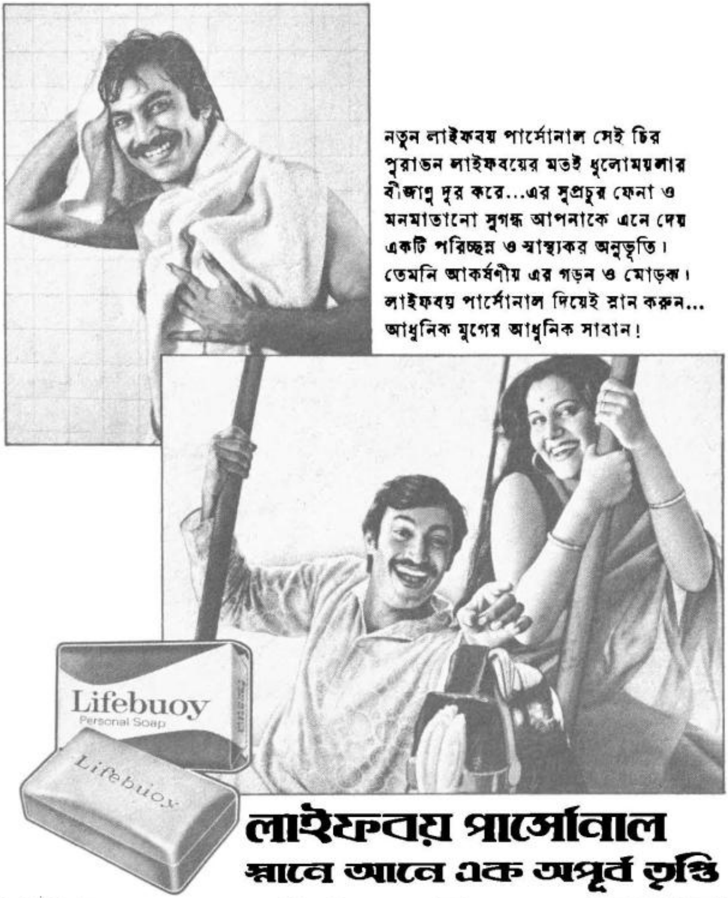

নতুন লাইফবয় পার্সোনাল সেই চির পুরাতন লাইফবয়ের মতই ধুলোময়লার বীজাণু দূর করে...এর সুপ্রচুর ফেনা ও মনমাতানো সুগন্ধ আপনাকে এনে দেয় একটি পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর অনুভূতি। তেমনি আকর্ষণীয় এর গড়ন ও মোড়ক। লাইফবয় পার্সোনাল দিয়েই স্নান করুন... আধুনিক যুগের আধুনিক সাবান!

লাইফবয় পার্সোনাল

স্নানে আনে এক অপূর্ব তৃপ্তি

হিন্দুস্থান লিভার-এর একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

লিনটাস-LP.10-1812 BG

নিয়েছিলাম, ইংল্যাণ্ডকে ইনিংসে হারিয়ে দিয়ে। টেস্ট ক্রিকেটে সেই আমাদের প্রথম জয়। মাদরাজে রচিত হয়েছিল ভারতীয় টেস্ট ক্রিকেটের এক উজ্জ্বল ইতিহাস। পঁচিশতম সরকারি টেস্টের মাথায় ভারত প্রথম জয়ের স্বাদ পেল।

নাইজেল হাওয়ার্ড সে-টেস্টে অধিনায়কত্ব করেননি। হাওয়ার্ডের অনুপস্থিতিতে দলকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ডোনাল্ড কার। মাদরাজ টেস্টে দলে ফিরিয়ে আনা হয়েছিল মুস্তাক আলিকে। আমার সঙ্গে মাঁকড় অবশ্য খুব ভাল খেলছিলেন। তবু দলে একজন নির্ভেজাল ওপেনারের প্রয়োজন ছিল। আর প্রয়োজন ছিল মিডল-অর্ডার ব্যাটিংয়ে শক্তিবৃদ্ধি করার। মিডল-অর্ডারের শক্তি বাড়াতে হলে মাঁকড়কে নীচে নামিয়ে আনতে হয়। তাই মুস্তাককে দলে নেওয়ার দরকার হয়ে পড়েছিল। ওদিকে, মুস্তাকের সঙ্গে বোর্ডের যে ভুল বোঝাবুঝির পালা চলছিল, তা ততদিনে শেষ হয়ে গেছে। সুতরাং মুস্তাক দলে এলেন।

পলি, মানে পলি উম্রিগড় আগের চারটে টেস্টে বিশেষ সুবিধে করতে না পারায় পঞ্চম টেস্টে চূড়ান্ত একাদশ থেকে তাঁকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। পলি হয়েছিলেন দ্বাদশ ব্যক্তি। কিন্তু কপালে যা লেখা আছে তা খণ্ডাবে কে? হেমু অধিকারী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ার ফলে শেষ মুহূর্তে পলিকে দলে নিতে হল। আর আশ্চর্য ব্যাপার, সেই ম্যাচে পলি উম্রিগড় একটা সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে বসলেন। পঞ্চম টেস্টে দুটো সেঞ্চুরি হয়েছিল। একটা আমার, আর একটা পলির। টেস্ট শুরু হওয়ার আগে ফাদকার ওঁকে ঠাট্টা করে বলেছিলেন, "ভাগ্যটা তোমার খুবই ভাল দেখছি। বাদ পড়তে পড়তে বেঁচে গেলে।" উম্রিগড় সেঞ্চুরি করে প্রমাণ করেছিলেন মাদরাজ টেস্টে তাঁর ভাগ্যটা সত্যিই ভাল ছিল।

টসে জিতে ডোনাল্ড কার ব্যাটিং নিলেন। কিন্তু ভিনু মাঁকড়ের ঘূর্ণি-বলে চোখে সর্ষেফুল দেখলেন ইংল্যাণ্ড দলের ব্যাটসম্যানরা। ভয়ংকর বোলিং করে মাঁকড় আট উইকেট দখল করেছিলেন। বিনিময়ে খরচ করেছিলেন মাত্র পঞ্চান্ন রান। দুশো ছেষট্টি রানে ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংস যখন শেষ হয়ে গেল, মাঁকড়ের বোলিং-গড় কী দাঁড়িয়েছিল জানো? ৩৮·৫—১৫—৫৫—৮। ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ভিনু রেকর্ড সৃষ্টি করেছিলেন। কোনো ভারতীয় বোলার এর আগে ক্রিকেটের পিতৃভূমির বিরুদ্ধে বোলিংয়ে এমন কৃতিত্ব দেখাতে পারেননি। ইংল্যাণ্ডকে বিপর্যস্ত করার কাজে মাঁকড়কে সব চাইতে বেশি সাহায্য করেছিলেন বাংলার পি· সেন। গ্রেভনি, কার, হিলটন ও স্ট্যাথামকে স্টাম্প করেছিলেন খোকন সেন। এর মধ্যে গ্রেভনিকে যেভাবে স্টাম্প করেছিলেন, বহুকাল তা মনে থাকবে। চমৎকার ক্ষিপ্রতা ও দক্ষতায় এই বঙ্গসন্তান গ্রেভনির উইকেটের বেল তুলে নিয়েছিলেন।

ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংস ২৬৬ রানে শেষ হয়ে যাওয়ার পর ভারতীয় দল ব্যাট করতে নামল। বলা বাহুল্য, মুস্তাক আলি ও আমি গোড়াপত্তন করতে গেলাম। দীর্ঘকায় মুস্তাকের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে উইকেটের দিকে যাওয়ার সময় আমি রীতিমত রোমাঞ্চ বোধ করছিলাম। মুস্তাক—সাহসী ব্যাটিংয়ের একটি সুন্দর দৃষ্টান্তের নাম মুস্তাক। ব্যাট হাতে মাঠে উচ্ছলতার নাম মুস্তাক। এই সেই মুস্তাক আলি, যাঁর খেলা দেখার জন্য আমি সব কিছু করতে রাজি ছিলাম। মুস্তাকের খেলা দেখার জন্যে কী না করেছি! ওই ছন্দোময় অথচ পরাক্রান্ত ব্যাটিং দেখতে সর্বত্র যেতে রাজি ছিলাম। মাঠে তাঁকে দেখলে মনে হত, একটি দামাল ছেলে ব্যাট নিয়ে মাঠে

নেমেছে, বোলারদের হেনস্থা করার জন্য। অপ্রতিরোধ্য, দুর্বার শক্তি দাপিয়ে বেড়াচ্ছে গোটা মাঠ। গুড লেংথ বল থেঁতলে যাচ্ছে ব্যাটের ঘায়ে। শর্টপিচ ছিটকে পড়ছে বাউণ্ডারির ধারে। ওভারপিচ পড়লে তো কথাই নেই। মুস্তাক নাস্তানাবুদ করে দিতেন বোলারদের। কিন্তু, দর্শকরা যখন সেঞ্চুরি অবধারিত বলে ভাবছেন, তখন হয়তো খুব বাজে বলে আউট হয়ে গেলেন মুস্তাক। মাঠভর্তি লোকের হৃদয় হাহাকার করে উঠত। আহা, মুস্তাক আউট হয়ে গেলেন! আর সেঞ্চুরি করলে? লোকের মুখে মুখে মুস্তাকের নাম ফিরত। ভেবে দেখ, মানুষের মনে কতখানি জায়গা করে নিয়েছিলেন মুস্তাক আলি।

বিজয় মার্চেন্ট নিঃসন্দেহে আমার প্রিয়তম ব্যাটসম্যান। কিন্তু যাঁদের ব্যাটিংয়ের কথা ভাবলে আজও উচ্ছ্বসিত হই, তাঁদের একজনের নাম মুস্তাক আলি। মুস্তাক সম্পর্কে একবার বলতে শুরু করলে থামা ভারী কঠিন। থামতে ইচ্ছে করে না। কত গল্প, কত ঘটনা! বলতে শুরু করলে, বহু রাত গড়িয়ে ভোর হয়ে যাবে।

সেই মুস্তাকের সঙ্গে ইনিংস ওপেন করতে যাওয়ার সময় কেন রোমাঞ্চিত হয়েছিলাম, এখন বুঝেছ নিশ্চয়ই। মুস্তাক বেশিক্ষণ ক্রিজে রইলেন না। ২২ রানের একটি ইনিংস খেলে বিদায় নিলেন। ততক্ষণে স্ট্যাথাম-রিজওয়ের বোলিংকে আমি সহজভাবে খেলতে শুরু করেছি। ট্যাটারসল-হিলটনকেও খেলতে কোনো অসুবিধে হচ্ছে না। মনকে স্থির করে নিলাম, অধৈর্য হলে চলবে না, চঞ্চলতা নয়, ধীরেসুস্থে নিজের ইনিংসকে গড়তে হবে। সেই ভাবে খেলতে লাগলাম। ফলে মাদরাজে আমার দ্বিতীয় টেস্ট সেঞ্চুরি এল। ইনিংসটা একেবারে নির্ভুল ছিল বলব না। নব্বই রানের মাথায় কারের বলে কট অ্যাণ্ড বোল্ডের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছিল। ডোনাল্ড কার সেটি ধরে রাখতে পারলেন না। টেস্ট ম্যাচের শেষে অধিনায়ক কার আমাকে আক্ষেপ করে বলেছিলেন, "ওই ক্যাচটা নিতে পারলে খেলার চেহারা পালটে যেতে পারত, পঙ্কজ। হয়তো তোমরা এ খেলায় জিততে পারতে না।" আমার শতরান (১১১) ছাড়া পলি উম্রিগড়ও ওই ইনিংসে শতরান (অপরাজিত ১৩০) করেছিলেন। সে কথা তো আগেই বলেছি।

নয় উইকেটে চারশো সাতান্ন রানের মাথায় অধিনায়ক হাজারে ইনিংসের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করলেন। অর্থাৎ, আমরা একশো একানব্বই রানে এগিয়ে রইলাম।

ইংল্যাণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংসের শুরুতেই বিপর্যয় ঘটল। পনেরো রানের মধ্যে দুজন ওপেনার বিদায় হলেন। লোসনকে বিদায় করে দিলেন দাত্তু ফাদকার। স্পুনার আউট হলেন রমেশ দিভেচার বলে। তারপর স্পিন বোলিংয়ে ভেলকি দেখালেন মাঁকড় ও গোলাম আমেদ। গোলাম আমেদ ছিলেন অফ-স্পিনার, অফস্পিনের ফাঁদে জড়িয়ে টম গ্রেভনি এবং রবার্টসনের উইকেট তুলে নিলেন গোলাম। ন্যাটা মাঁকড় দখল করলেন ওয়াটকিন্সের মূল্যবান উইকেট। ওয়াটকিন্স আউট হওয়ার ফলে আমাদের জয়ের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে ইনিংসে রবার্টসন সব চাইতে বেশি রান (৫৬) করেছিলেন। কিন্তু ওয়াটকিন্সকে দেখে মনে হচ্ছিল, রান নয়, ইংল্যাণ্ডের সম্মান বাঁচাবার জন্য তিনি দাঁতে দাঁত চেপে লড়াই করে যাচ্ছেন। আটচল্লিশ রানের মাথায় মাঁকড়ের বলে কট অ্যাণ্ড বোল্ড হয়ে গেলেন তিনি। বলের ফ্লাইট ঠিকমতো বুঝতে না পারার ফলে ওয়াটকিন্সকে ফিরে যেতে হল। শেষ ভরসা ছিল কার ও পুলের জুটির ওপর। কিন্তু গোলাম তখন অপ্রতিরোধ্য, ভিনু

ভয়ংকর। শেষ ভরসার জুটিকে ছিন্নভিন্ন করে দিলেন গোলাম। পুল সহজ ক্যাচ দিলেন দিভেচার হাতে। বাঁ দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে ডোনাল্ড কারের ক্যাচ নিলেন ভিনু। বাকি তিনটি উইকেটও বেশিক্ষণ টিঁকল না। সাবড়ে দিলেন মাঁকড়। হিলটনকে স্টাম্প করলেন পি· সেন। স্ট্যাথাম ধরা পড়লেন গোপীনাথের হাতে। আর কিছু বোঝবার আগে ফ্রেডি রিজওয়ের উইকেট ঝাঁকুনি খেয়ে হেলে গেল। একশো তিরাশি রানে মুড়িয়ে গেল ইংল্যাণ্ডের ইনিংস। এক ইনিংস ও আট রানে জয়ী হল ভারত।

সরকারি টেস্টে ভারতের প্রথম জয় হল মাদরাজে। জয়ের আনন্দে উদ্বেলিত হল স্টেডিয়াম ভর্তি দর্শকরা। হাতাতালি আর চিৎকার তো থামতেই চায় না। আলিঙ্গনে-অভিনন্দনে আমরা ভেসে গেলাম। কেউ কোলে তুলে নিল, কেউ জড়িয়ে ধরে চুমু খেল। সে এক অবর্ণনীয় অবস্থা। কীভাবে, কেমন করে যে সে-দিনটা কেটে গেছে টেরই পাইনি। সারা দিন ও রাত বিচিত্র এক উত্তেজনার মধ্যে কেটে গিয়েছিল। আমার মনে আছে, খেলা শুরু হওয়ার আগে খোকনদা, মানে প্রবীর সেন বলেছিলেন, "দুই বাঙালি এক সঙ্গে খেলছি। ভাল করে খেলতে হবে আমাদের।" সায় দিয়ে বলেছিলাম, "হ্যাঁ, ঠিক। ভাল আমাদের খেলতেই হবে।"

আমার শতরানের জন্য খোকনদা আমাকে অভিনন্দন জানাতেই আমি জড়িয়ে ধরলাম তাঁকে। টেস্টে সেঞ্চুরি করা নিঃসন্দেহে বিরাট গৌরবের বিষয়, কিন্তু এক ইনিংসে চারটে স্টাম্পিং তো কম কথা নয়। খেলা শেষ হওয়ার পর প্রবীর সেন আনন্দে আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলেন। "শাবাশ। পঙ্কজকে বাদ দিয়ে এ জয়ের ইতিহাস কখনও লেখা যাবে না। থ্যাঙ্ক ইউ। আজ তুই বাঙালির মান বাড়ালি ভাই।"

মাদরাজ টেস্টে খোকনদা অতুলনীয় উইকেটকিপিং করেছিলেন। সে খেলা যাঁরা দেখেছেন সহজে ভুলতে পারবেন বলে মনে হয় না। বাঙালির মানবৃদ্ধিতে তাঁরও অবদান ছিল অনেকখানি। "তুমিও চমৎকার খেলেছ, খোকনদা। এ জয়ে তোমার অবদানও কম নয়। কনগ্র্যাচুলেশনস্।"

হাত ঝাঁকিয়ে মিষ্টি হেসেছিলেন পি· সেন।

পি· সেন আর আমাদের মধ্যে নেই। অনেকদিন আগে মারা গেছেন। ভারী মজার মানুষ ছিলেন তিনি। সুন্দর গল্প করতে পারতেন। দুর্ভাগ্য তোমাদের, তোমরা এই মেজাজি মানুষটির সঙ্গে আলাপ করার সুযোগ পেলে না। (ক্রমশ)

একবার ইসরায়েলের প্রেসিডেন্ট পদগ্রহণের অনুরোধ এল আইনস্টাইনের কাছে। তিনি সবিনয়ে তাঁর অস্বীকৃতি জানিয়ে বললেন, প্রকৃতির তবু কিছু কিছু বুঝি, মানুষের রহস্যের কিছুই বুঝি না।

ফুলগুলি

সাধনা মুখোপাধ্যায়

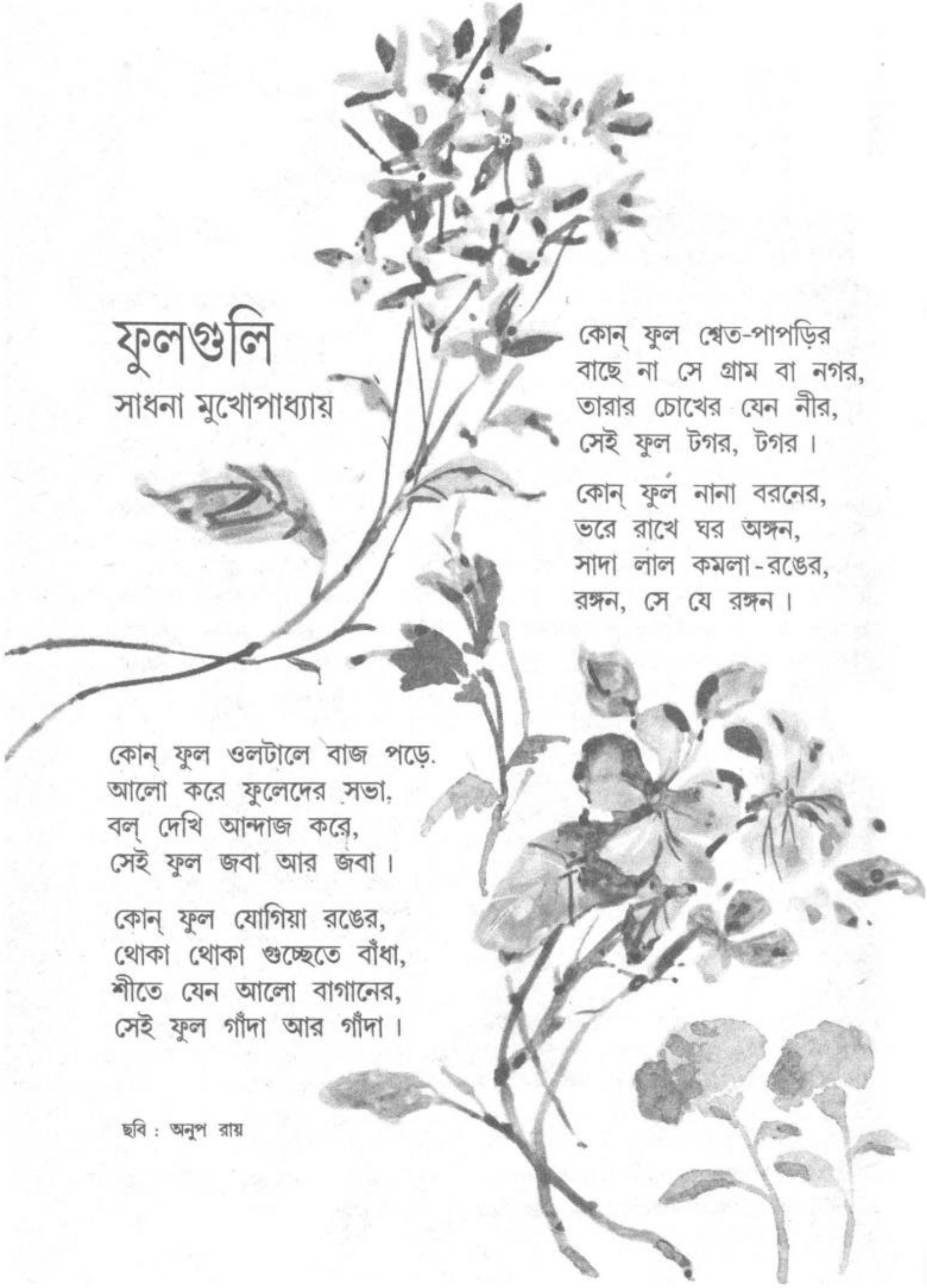

কোন্ ফুল শ্বেত-পাপড়ির
বাছে না সে গ্রাম বা নগর,
তারার চোখের যেন নীর,
সেই ফুল টগর, টগর।

কোন্ ফুল নানা বরনের,
ভরে রাখে ঘর অঙ্গন,
সাদা লাল কমলা-রঙের,
রঙ্গন, সে যে রঙ্গন।

কোন্ ফুল ওলটালে বাজ পড়ে.
আলো করে ফুলেদের সভা,
বল্ দেখি আন্দাজ করে,
সেই ফুল জবা আর জবা।

কোন্ ফুল যোগিয়া রঙের,
থোকা থোকা গুচ্ছেতে বাঁধা,
শীতে যেন আলো বাগানের,
সেই ফুল গাঁদা আর গাঁদা।

ছবি : অনুপ রায়

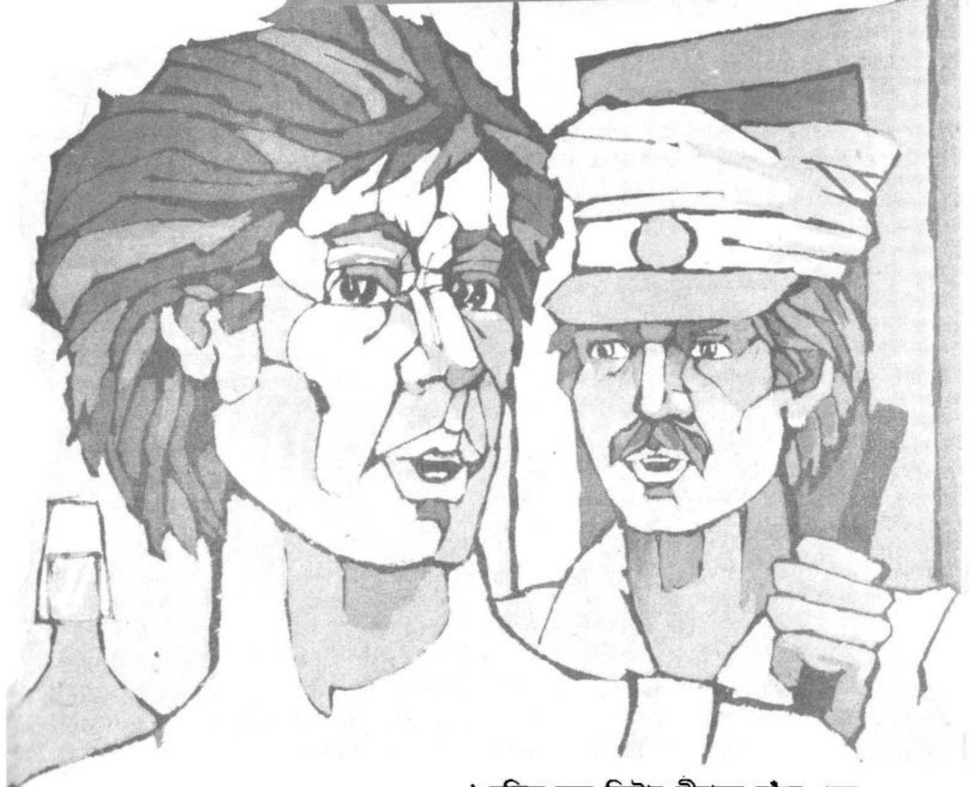

ছকুর ভুল

সুভদ্রকুমার সেন

মিস্টার দয়ানন্দ শ্রীবাস্তব আর তাঁর স্ত্রী শকুন্তলা দেবী যখন বিয়ের নেমন্তন্ন সেরে বাড়ি ফিরলেন তখন রাত প্রায় সাড়ে-বারোটা। ঘরে ঢুকে জামাকাপড় বদ্‌লাতে যাবেন আর অমনি 'লোড-শেডিং' হয়ে গেল। অন্ধকারে কোনো রকমে হাতড়ে-হাতড়ে একটা মোমবাতি জ্বেলে শকুন্তলা দেবী কাপড়-চোপড় ছেড়ে গয়নাগুলো গোদরেজের আলমারিতে তুলে রাখবেন ভেবে আলমারির চাবিটা খুঁজছিলেন, কিন্তু পাচ্ছিলেন না। যাবার সময় শকুন্তলা দেবীর তৈরি হতে দেরি হচ্ছিল বলে মিস্টার শ্রীবাস্তব তাঁকে এমন তাড়া লাগিয়েছিলেন যে, হুড়োহুড়ি করে কোথায় যে চাবিটা রেখে গেছেন তা কিছুতেই মনে করতে পারছিলেন না। বেশ কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক খুঁজেও চাবিটা যখন পেলেন না, তখন তিনি গয়নাগুলো ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারে তুলে রেখে শুয়ে পড়লেন।

এপ্রিল মাসের শেষ। কলকাতায় এ-বছর এর মধ্যেই বেশ গরম পড়েছে। একে সন্ধে থেকেই ঘরের জানালা-দরজা সব বন্ধ ছিল, তার ওপর আবার লোড-শেডিংয়ের জন্যে পাখা বন্ধ তাই শকুন্তলা দেবী দরজায় খিল দিয়ে জানালাগুলো সব খুলে রেখে শুয়ে পড়লেন। আর শোবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়লেন।

পরদিন সকালে মিস্টার শ্রীবাস্তবের ঘুম ভাঙল স্ত্রীর চিৎকারে: "ওগো শুনছ, কাল রাত্তিরে আমাদের ঘরে চোর এসেছিল।" মিস্টার শ্রীবাস্তব উঠে দেখলেন জানালার দুটো লোহার রড বাঁকানো।

প্রত্যেক থানায় সেই অঞ্চলের দাগি চোর-গুণ্ডা আর বদমায়েসদের নামের আর সম্ভাব্য বাসস্থানের একটা তালিকা থাকে। মিস্টার শ্রীবাস্তব এই অঞ্চলের একজন বিশিষ্ট অধিবাসী। তাই তাঁর মুখে ঘটনার সব খুঁটিনাটি বিবরণ শুনে থানার বড়বাবু শ্রীলালমোহন দাশ ওরফে লালুদারোগা দ্বিপ্রাহরিক ভোজনপর্ব শেষ করে শ্রীনাথ দাস লেনের বিরাট বস্তির ৪৬ নং বাড়িতে এসে ছকুর খোঁজ করতেই ছকু বেরিয়ে এল।

"এই যে স্যার, কি খবর"—ছকু লালুদারোগাকে এমন অমায়িক ভাবে প্রশ্ন করলে যেন সে লালুদারোগার এই হঠাৎ আসায় খুবই খুশি হয়েছে।

ছকুর মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে লালুদারোগা বললেন, "ভেতরে চলো। কথা আছে।"

"আসুন, স্যার আসুন! আমার কী সৌভাগ্য।" ছকুর গলায় বিনয় যেন ঝরে পড়ছে।

বস্তিবাড়ির ছোট ঘর। লালুদারোগা খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে ঘরটা দেখতে লাগলেন। আসবাবের মধ্যে একটা নেয়ারের খাটিয়া আর তার ওপর একটা আধময়লা সুজনি পাতা। খাটিয়ার তলায় একটা টিনের স্যুটকেস। ঘরের এক কোণে একটা দড়ি খাটানো। তাতে ঝুলছে কয়েকটা জামা-কাপড়। দরজার ওপরে একটা তাক। সেই তাকের ওপরে আছে আর্শি, চিরুনি, দাড়ি কামাবার সরঞ্জাম আর দু-একটা জিনিস। ঘরের কোণে একটা কাঠের টুলের ওপর কাঁচের গেলাস চাপা মাটির কুঁজো বসানো। ছকু তাড়াতাড়ি কুঁজোটা মেজেয় নামিয়ে টুলটা হাত দিয়ে ঝেড়ে মুছে লালুদারোগার দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বললে, "কোথায় যে স্যার আপনাকে বসতে দিই।"

লালুদারোগা তার কথা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে বললেন, "কাল রাত্তিরে সুকিয়া স্ট্রিটের একটা বাড়ির দোতলার ফ্ল্যাট থেকে এক সেট মুক্তোর গয়না আর সোনার চুড়ি চুরি গেছে। মালগুলো এখনো নিশ্চয়ই পাচার করতে পারোনি। আমাকে দিয়ে দাও।"

জগতের সমস্ত বিস্ময় গলায় ফুটিয়ে তুলে ছকু বললে, "এ আপনি কী বলছেন স্যার! মুক্তোর সেট—সোনার চুড়ি—আমার কাছে! বিশ্বাস করুন স্যার, ভগবানের দিব্যি বলছি আমি কিছু জানি না। আর তা ছাড়া ও-সব লাইন আমি এখন ছেড়ে দিয়েছি!"

লালুদারোগা তার কথার কোনো উত্তর দিলেন না দেখে ছকু অভিমানের সুরে বললে, "এই তো স্যার আমরা সৎপথে থাকলেও আপনারা ভাবেন আমরা অসৎ। বিশ্বাস করুন স্যার যাদের গয়না চুরি গেছে তাদের জন্যে আমার খুবই দুঃখ হচ্ছে। কিন্তু আমি এ ব্যাপারে বিন্দু-বিসর্গ কিছুই জানি না।"

লালুদারোগা ছকুর কোনো কথাই শুনছিলেন না। তার চোখ দুটো ঘরের চারদিকে ঘুরছিল। তার অবচেতন মন কেবলই বলছিল, ঐ ঘরে এমন একটা কিছু জিনিস আছে যেটা ওখানে থাকার সঙ্গত কোনো কারণ নেই। কিন্তু তার সচেতন মন কিছুতেই সেই জিনিসটা ধরতে পারছিল না।

ছকু বললে, "আচ্ছা স্যার, আমার কথায় বিশ্বাস না হয় তো সার্চই করে দেখুন।"

লালুদারোগা সার্চ ওয়ারেন্ট আনেননি। তাই চুপ করে রইলেন। তারপর প্রসঙ্গ পালটে বললেন, "আচ্ছা ছকু, তোমার এখন

চলে কী করে ? শুনতে পাই তো তোমার দোকান এখন ভাল চলছে না।”

“আপনি ভুল শুনেছেন স্যার। দোকান আমার ভালই চলছে। আর তা ছাড়া আমি তো একলা মানুষ।”

“কাল রাত্তিরে তুমি কী করছিলে ?”

“কাল স্যার শরীরটা ম্যাজম্যাজ করছিল। তাই দোকান থেকে ফিরেই একটা সারিডন খেয়ে শুয়ে পড়েছিলুম।”

“কাল সারা রাত তুমি তাহলে ঘরেই ছিলে ?”

“হ্যাঁ স্যার। আপনার বিশ্বাস না হয় তো আশেপাশের লোককে জিজ্ঞেস করে দেখুন।”

লালুদারোগা জানেন যে আশেপাশের লোকদের জিজ্ঞেস করলে সকলেই ছকুর হয়ে সাক্ষি দেবে। তাই তিনি খানিকটা অন্ধকারেই ঢিল ছুঁড়লেন, “তবে যে ঐ বিটের কনস্টেবল হরিচরণ বললে যে কাল রাত্তিরে সে তোমাকে কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটে দেখেছে।”

ছকু ঘাগি লোক। এত সহজে লালু দারোগার ফাঁদে পা দেবার পাত্র নয়। তাই একটু মুচকি হেসে বললে, “হরিচরণ নেশার মাত্রাটা বাড়িয়ে দিয়েছে স্যার।”

লালুদারোগা বুঝলেন, চালে ভুল হয়েছে। তিনি চুপ করে গেলেন। কিন্তু তাঁর মনের খুঁতখুঁতুনিটা কিছুতেই যাচ্ছিল না। তাঁর কেবলই মনে হচ্ছিল, চোখের সামনে, হাতের কাছেই এমন একটা সূত্র রয়েছে যার থেকে চুরির ব্যাপারটার ফয়সালা হয়ে যাবে। তাঁর মন বলছে ঘরের জিনিসপত্রের মধ্যে কোথায় যেন একটা বড় রকমের অসঙ্গতি রয়েছে। কিন্তু সেই অসঙ্গতিটা কী আর কোথায় সেই অসঙ্গতি লালু দারোগা কিছুতেই ধরতে পারছিলেন না। লালুদারোগার মনের অস্থিরতা ক্রমেই বেড়ে চলল। হঠাৎ তাঁর খেয়াল হল যে অনেকক্ষণ তিনি চুপ করে বসে আছেন আর ছকু তাকে গভীরভাবে লক্ষ করছে। আর বসে থাকার কোনো অজুহাত না পেয়ে বাধ্য হয়েই মনের অস্থিরতা মনে চেপে রেখে লালুদারোগা উঠে পড়লেন।

ছকুর বাড়ি থেকে একটু যেতেই সেই অসঙ্গতিটা লালুদারোগার মাথায় হঠাৎ বিদ্যুৎ-চমকের মতো ঝলসে উঠল। তিনি তাড়াতাড়ি ফিরে চললেন।

“আবার কী মনে করে,” ছকু লালুদারোগাকে প্রশ্ন করল । এবার ছকুর মুখে সেই অমায়িক আপ্যায়নের ভাবটা যেন নেই বলেই তাঁর মনে হল। কোনো কথা না বলে ছকুর ঘরে ঢুকে দরজার ওপরে তাকের দিকে চাইতেই তিনি দেখলেন—না সেই জিনিসটা নেই।

“এখানে যে গ্লোবটা ছিল সেটা কই ?”

ছকু কোনো উত্তর দেবার আগেই লালুদারোগার নজর পড়ল ছকুর হাতে ধরা চটের থলিটার দিকে। থলিটা নিয়ে ছকু সটকাবার চেষ্টা করতেই লালুদারোগা তাকে সবলে জাপটে ধরলেন।

ছকুকে নিয়ে থানায় ফিরে এসে লালুদারোগা গ্লোবটাকে স্ট্যাণ্ড থেকে খুলে নিয়ে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখলেন যে, গ্লোবটা উলটো করে বসানো ছিল। তার নজরে পড়ল গ্লোবটার বিষুবরেখা বরাবর কেমন একটা ঘষার দাগ। সে বুঝলে টিনের গ্লোবটাকে খুলে আবার জোড়া লাগাবার সময় ঐ দাগ পড়েছে। আর তার পর স্ট্যাণ্ড বসাবার সময় উলটে লাগিয়েছে। লালুদারোগা গ্লোবের মাঝখানে একটু চাপ দিতেই গোলার্ধ দুটো খুলে গেল। আর ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়ল তুলোর একটা বাণ্ডিল। বাণ্ডিলটা খুলতেই দেখা গেল তার মধ্যে রয়েছে ঝকঝকে কয়েকগাছা সোনার চুড়ি আর মুক্তোর একটা সেট।

ছবি : জয়ন্ত ঘোষ

হারিয়ে যাওয়া

অশোক বসু

ঠিক যখন ঠামার ঘরে ঢং করে একটা বাজার শব্দ হল আর বংশী রোজ দুপুরের মতো মাকে জানিয়ে বাইরে গেল, তখনই টুকাই বুঝতে পারল মা এখন ঘুমোতে আসবে। আর, একটু পরেই যখন টের পেল মা আসছে তখন চোখ বন্ধ করে শুয়ে পড়ল।

মা ঘরে ঢুকে বিছানার সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, "বাহ্! আজ তো টুকাই গুড বয় হয়ে গেছে? নিজে-নিজেই ঘুমিয়ে পড়েছে।"

মা'র কথা শুনে টুকাই আরো শক্ত করে চোখ বন্ধ করে রাখল। মা আবার বললেন, "কিন্তু ঘুমোলে তো লোকে পা নাড়ে, কই টুকাই তো নাড়ছে না।"

টুকাই সঙ্গে সঙ্গে পা নাড়ল আর মা হেসে উঠে বললেন, "ও দুষ্টু ছেলে, এই তোমার ঘুম?"

ধরা পড়ে গিয়ে টুকাই লজ্জা পেয়ে গেল। আর লজ্জাটা হয়ে গেল রাগ।

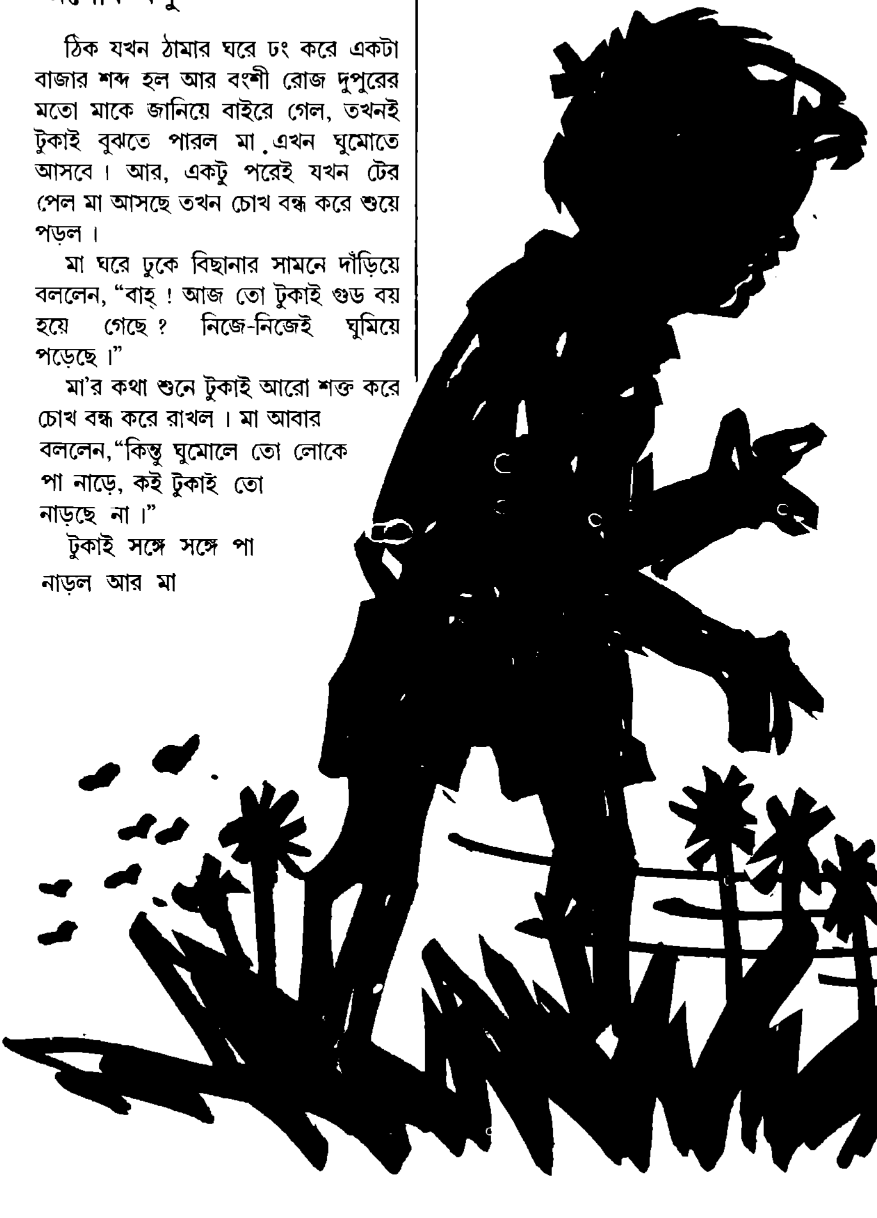

ধড়মড় করে উঠে বসল বিছানায়। মা ফের তাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে বললেন, "জগাপাগলা ঘুরছে কিন্তু। না ঘুমালে ধরে নিয়ে ঝোলায় পুরে নেবে।"

জগাপাগলার নাম শুনে টুকাই চুপ করে মা'র পাশে শুয়ে থাকল। খুব ভয়ের লোক এই জগা। মতিই একদিন টুকাইকে দেখিয়েছিল। আধ-পাগলা চেহারা, মুখ-ভর্তি দাড়িগোঁফ, ছেঁড়া জামাকাপড়, পিঠে একটা বস্তা। বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে হন হন করে যাচ্ছিল। দেখেই টুকাই দৌড়ে পালিয়ে এসেছিল মা'র কাছে। জগা নাকি ছোট ছেলেমেয়েদের ধরে ওর ঝোলার মধ্যে পুরে রাখে। এমনি নিঝুম দুপুরে কেউ যখন রাস্তায় থাকে না, বাবা অফিসে, ছোটকাকা কলেজে, দিদি ইস্কুলে, সমস্ত পাড়া সুনসান, তখন জগাপাগলা রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। কোন্ ছেলেটা ঘুমাচ্ছে না, মার কথা শুনছে না, জগা ঠিক টের পেয়ে যায়। অমনি জানলার পাশে এসে ফুসমন্তর করে তাকে ধরে নিয়ে ঝোলায় ঢুকিয়ে দেয়।

টুকাই ভয়ে ভয়ে চোখ বন্ধ করল। চোখ বন্ধ করলে জগা ভাববে টুকাই ঘুমাচ্ছে।

আধো ঘুমের মধ্যে মা টুকাইয়ের গায়ে হাত রাখলেন, "ঘুমাও লক্ষ্মীসোনা। সন্ধেবেলায় বাবার সঙ্গে রানুপিসির বাড়িতে যাব।"

রানুপিসির বাড়িতে গেলে খুব মজা হয়। এই জলপাইগুড়ি শহরে টুকাইরা যেমন হাকিমপাড়ায় থাকে, তেমনি রানুপিসিরা থাকে আনন্দপাড়ায়। রানুপিসির ছেলে টুম্পার একটা লাল রঙের তিনচাকার সাইকেল আছে। টুকাই রানুপিসির বাড়িতে গেলেই সেই সাইকেলে চড়ে। টুম্পা চড়তে দেয় না। কিন্তু রানুপিসি খুব ভাল। তিনি টুম্পাকে বকেন। বকুনি খেয়ে টুম্পা কাঁদে, কিন্তু টুকাইয়ের সাইকেল চড়া হয়ে যায়। বাবা বলেছেন, টুকাইকেও একটা চমৎকার সাইকেল কিনে দেবেন। তখন টুকাইও টুম্পাকে সেই সাইকেলে চড়তে দেবে না।

টুকাই চোখ বন্ধ করে ছিল। কিন্তু

কতক্ষণ আর এমনিভাবে মিছিমিছি চোখ বন্ধ করে থাকা যায় ! চোখ খুলে সে মাকে দেখল। মা ঘুমাচ্ছে। জানলার দিকে তাকাল। এখন যদি জগাপাগলা জানলায় উঁকি দেয় আর দেখে টুকাই জেগে আছে ! জগাপাগলা কি সত্যি সত্যিই মন্ত্র পড়ে ধরে নেয় ? কিন্তু কালুকে তো ধরে না ? কালু টুকাইয়ের থেকে মাত্র তিন বছরের বড়, তাদের বাড়ির সামনে যে বস্তিবাড়ি আছে সেখানে থাকে। সে কক্ষনো ঘুমায় না, সারা দুপুর ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, গাছে চড়ে, গুলতি দিয়ে পাখি মারে, জগাকেও ভয় পায় না। কালুকে জগা ধরে না কেন ?

ভাবতে ভাবতে টুকাই হঠাৎ বলে ফেলল, "কালু তো ঘুমায় না।"

মার ঘুমটা ভেঙে গেল। টুকাইকে কথা বলতে শুনে ধমকে দিয়ে বললেন, "এখনো ঘুমাসনি ? সারাদিন দস্যিপনা, না ? নিজেও ঘুমাবি না, আমাকেও ঘুমাতে দিবি না। চুপ করে ঘুমিয়ে পড়।"

টুকাই আর কী করে, চুপ করেই শুয়ে থাকল। শুয়ে থাকতে থাকতে মা'র উপর অভিমান হল। বাবা এলে ঠিক বলে দেবে মা বকেছে। ঘুমপাড়ানি মাসিপিসি এসে ওকে ঘুম না পাড়িয়ে দিলে ও কী করবে ? ঠিক তখনই টুক করে কী যেন শব্দ হল। জানলার দিকে তাকাতেই টুকাই অবাক হয়ে গেল। কালু তাকে ডাকছে। হাতের ইশারায় বাইরে আসতে বলছে। টুকাই ভয়ে-ভয়ে মা'র দিকে তাকাল। মা অঘোরে ঘুমাচ্ছে। টুকাই আবার কালুর দিকে তাকাল। কালু গুলতি দেখিয়ে পাখি মারার ভঙ্গি করছে।

টুকাইয়ের ভীষণ লোভ হল কালুর সঙ্গে যেতে। কালু মানেই যত সব মজাদার খেলা, দারুণ-দারুণ সব কাণ্ড, অজানা জগতের হাতছানি। টুকাই আবার মাকে দেখল। মা এখন অনেকক্ষণ ঘুমাবে। টুকাই যদি বাইরে গিয়ে একটু পরেই আবার ফিরে আসে মা টেরই পাবে না। আস্তে আস্তে বিছানা থেকে নেমে সে দরজার কাছে এল। দরজাটা ভেজানো, ছিটকিনি দেওয়া নেই। টুকাই ঘাড় বেঁকিয়ে আবার মাকে দেখল, তারপর একটুও শব্দ না করে পাল্লাটা ফাঁক করে বাইরে এল।

বাইরে এখন কেউ নেই। উঠোন ফাঁকা, কুয়োতলা ফাঁকা, রান্নাঘরের বারান্দা ফাঁকা, বাঘা শুধু পেয়ারাগাছের ছায়ায় বসে জিভ বের করে হাঁপাচ্ছে। ঠামার ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। সেখান থেকেও কোনো শব্দ আসছে না। সিঁড়ি দিয়ে নেমে উঠোন পেরিয়ে সদর দরজার কাছে এল। কী ভাগ্যি, আজ দরজায় খিল দেওয়া নেই। টুকাই পেছন ফিরে ঘরের দিকে তাকাল। না, কেউ টের পায়নি। ওর বুক দুরদুর করছিল। কোনোদিন সে এই ভাবে বাইরে আসেনি।

কালু টুকাইকে দেখে হাসল, "এই টুকাই, জংলি-মাঠে যাবি ?"

টুকাই বলল, "মা জানতে পারলে ভীষণ বকবে কিন্তু।"

কালু ঠোঁট উলটে বলল, "জংলি-মাঠে কাঠবেড়ালি আছে। গুলতি দিয়ে মারব। যাবি না ?"

টুকাই ঘাড় কাত করে বলল, "যাব।"

জংলি-মাঠ হল টুকাইদের বাড়ির পেছনে ঝোপঝাড় আর এটা-সেটা গাছের জঙ্গল। এর আগে টুকাই কখনো আসেনি। অবাক হয়ে গেল সে। চারধারে গাছ-গাছালি, মাঝখানে একটা পুরনো পুকুর। লতা-পাতা আর আগাছায় পুকুর ঢেকে আছে, জল দেখা যায় না। কিন্তু কোথায় কাঠবেড়ালি ? দু-চারটে পাখি ছাড়া কিছুই দেখা গেল না। হঠাৎ সামনের দিকে তাকিয়ে কালু বলল, "ওই দেখ একটা ঘুড়ি, ভোকাট্টা।"

টুকাই দেখল দূরে শূন্য মাঠের ওপর দিয়ে একটা ঘুড়ি ভেসে যাচ্ছে। কালু ছুটল সেই ঘুড়ি ধরতে। ঘুড়ি তখন অনেক দূরে।

দুপুরের রোদ্দুরে ঝলসানো মাঠ, নদীর চর দিয়ে ছুটতে ছুটতে এক সময় কালু চলে গেল টুকাইয়ের চোখের আড়ালে।

কালু ওই রকমই। টুকাই একলা হয়ে গেল জংলি-মাঠে। চার পাশে সে তাকিয়ে দেখল। সমস্ত মাঠ জুড়ে জংলি গাছ আর বুনো ঘাসের জঙ্গল। কেউ কোথাও নেই। কোনো মানুষও নেই, শব্দও নেই। একটু আগে কালু ছিল, এখন ঘুড়ির পেছনে ছুটতে ছুটতে কোথায় চলে গেছে। মাঝে মাঝে হঠাৎ হাওয়ায় গাছের ডালপালা নড়ছে, শিরশির করে হাওয়ার শব্দ হচ্ছে। মনে হচ্ছে কারা যেন ফিসফিস করে বলছে, টুকাই এসেছে, টুকাই এসেছে।

হঠাৎ টুকাইয়ের বুক কেঁপে উঠল। গাছ আর ঝোপের আড়াল থেকে তিনকাল-ঠেকা থুত্থুড়ে এক বুড়ি টুকাইয়ের দিকে আসছে। বুড়ির শনের মতো পাকা চুল, গাল ভাঙা, মাজা ভাঙা, ছেঁড়া ময়লা কাপড়। হাতে শুকনো ডালপাতা। পেছনে জগাপাগলার মতন ঝোলা আছে কি না কে জানে। টুকাই কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

বুড়ি কাছে এসে একটু ঝুঁকে মুখটা কাছে এনে দেখল টুকাইকে, "আহা রে, সোনার চাঁদ বাছা আমার। কাদের ছেলে গা তুমি ?"

টুকাই চুপ করে থাকে। কথা বলবে কী, ভয়ে গলা শুকিয়ে গেছে।

বুড়ি আপন মনে মাথা নাড়ে। বলে, "তা বাছা, ভর-দুপুরে ইখানে একা কেন গা ? আদাড়ে-বাদাড়ে জায়গা, কী বলতে কী আছে।"

বুড়িকে ভয় লাগে না টুকাইয়ের। সাহস করে বলে, "তুমি জগাপাগলার মা ?"

ফোকলা মুখে বুড়ি হাসে আর মাথা নাড়ে। বলে, "তা বাছা, সব পাগলেরই মা আমি।"

বুড়ি আর দাঁড়ায় না। বিড়বিড় করতে করতে অনেক গাছের ছায়া-ছায়া অন্ধকারে ঢুকে যায়।

আর তখনই কী যেন একটা সরসর শব্দ করে সামনের ঝোপে ঢুকে গেল। ঝোপটা নড়ে উঠল। ভয়ে টুকাইয়ের হাত-পা হিম হয়ে গেল। ছোটকাকা বলেছিল জংলি মাঠে একটা শেয়াল আছে।• সেই শেয়ালটা ? টুকাই তাড়াতাড়ি অন্য দিকে চলে এল। এসে দেখল গাছ নেই, ঝোপ-জঙ্গল নেই, জংলি- মাঠ শেষ। সামনে অন্য মাঠ। গনগনে দুপুরে ধু-ধু করছে।

কোথা থেকে দমকা হাওয়া উড়ে আসে। মাঠের মাঝখানে শুকনো পাতা উড়ে উড়ে গোল হয়ে ঘোরে। তাই দেখতে দেখতে টুকাইয়ের বুকে ভয়টা আবার এসে যায়। তাড়াতাড়ি জংলি-মাঠে ফিরে এসে বাড়ির রাস্তায় যেতে চাইল। কিন্তু যত যায় জংলি-মাঠ আর শেষ হয় না, বাড়ির রাস্তাও খুঁজে পায় না। টুকাইয়ের কান্না পেয়ে গেল। সে মা'র কাছে যেতে পারছে না, জংলি-মাঠের গোলকধাঁধায় হারিয়ে গেছে।

টুকাই তখন পাগলের মতো দৌড়াচ্ছে। মজা পুকুরের পাশ দিয়ে অনেক গাছের মধ্যে দিয়ে ঘুরে ঘুরে কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছে না বাড়িতে যাবার রাস্তা। কালুর সঙ্গে কোন্ রাস্তায় এসেছিল মনেও নেই। টুকাই কাঁদতে কাঁদতে মাকে ডাকল।

তখনই টুকাই মা'র গলা শুনতে পেল। মা ছুটে আসছে। ডাকছে, "টুকাই, টুকাই, সোনা আমার।"

একটু পরেই মাকে দেখতে পেল। আলুথালু বেশ, পাগলের মতো। পেছনে ছোটকাকা। টুকাইয়ের কাছে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে মা বললেন, "কোথায় ছিলি টুকাই, খুঁজে পাচ্ছিলাম না তোকে ?"

টুকাই এক দৌড়ে মা'র কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে বুকে মুখ গুঁজে ফোঁপাতে-ফোঁপাতে বলল, "তুমি হারিয়ে গিয়েছিলে মা ?"

ছবি : দেবাশিস দেব

ভারতে প্রথম!
ইতালিয়ান অলিভ অয়েল
সমৃদ্ধ প্রসাধন

মিমি

অলিভ
টাচ্

আপনার সারা
জীবনের
সৌন্দর্য্যের সাথী

কোল্ড, ভ্যানিসিং, ফাউণ্ডেশন,
বডিট্যাল্ক, বডিলোশন
হোপস্ টয়লেটস্ প্রোডাক্ট (প্রাঃ) লিঃ কলিকাতা-১৯

dimal's

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

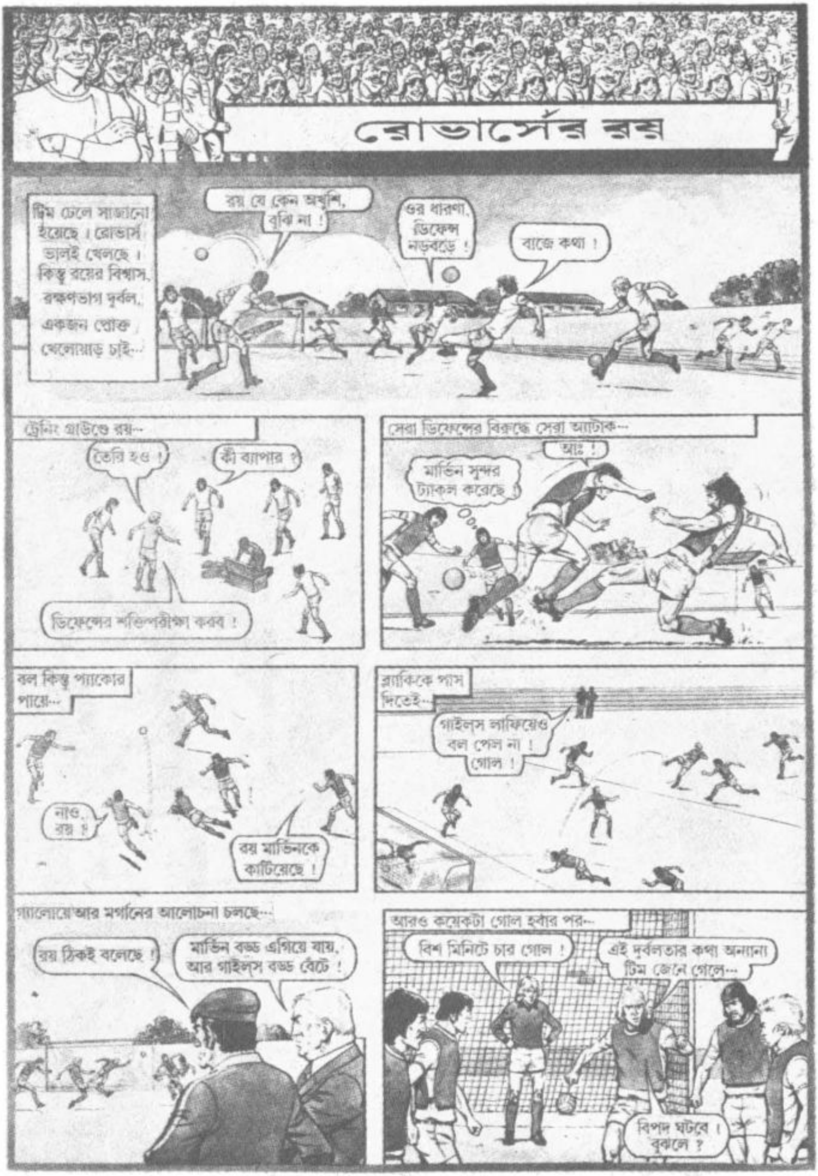
রোভার্সের রয়
টিম ঢেলে সাজানো হয়েছে। রোভার্স ভালই খেলছে। কিন্তু রয়ের বিশ্বাস, রক্ষণভাগ দুর্বল, একজন পোক্ত খেলোয়াড় চাই...
রয় যে কেন অখুশি, বুঝি না!
ওর ধারণা, ডিফেন্স নড়বড়ে!
বাজে কথা!
ট্রেনিং গ্রাউণ্ডে রয়...
তৈরি হও!
কী ব্যাপার?
ডিফেন্সের শক্তিপরীক্ষা করব!
সেরা ডিফেন্সের বিরুদ্ধে সেরা অ্যাটাক...
আঃ!
মার্ভিন সুন্দর ট্যাকল করেছে
বল কিন্তু প্যাকোর পায়ে...
নাও, রয়!
রয় মার্ভিনকে কাটিয়েছে!
ব্ল্যাকিকে পাস দিতেই...
গাইলস লাফিয়েও বল পেল না! গোল!
গ্যালোয়েআর মর্গানের আলোচনা চলছে...
রয় ঠিকই বলেছে!
মার্ভিন বড্ড এগিয়ে যায়, আর গাইলস বড্ড বেঁটে!
আরও কয়েকটা গোল হবার পর...
বিশ মিনিটে চার গোল!
এই দুর্বলতার কথা অন্যান্য টিম জেনে গেলে...
বিপদ ঘটবে! বুঝলে?

ট্রেনিং শেষ হবার পরে...
কারও সন্ধান পেলে ?
না। সবই...
বড্ড দাম হাঁকছে। অত দিতে রাজি নই !
ওয়েস্টবেরি আর রটনের সেকেণ্ড ডিভিশন লিগের খেলাটা দেখি...
পরদিন ওয়েস্টবেরির মাঠে...
রয়, টুপি কেন ?
চাই না, কেউ চিনুক !
খেলোয়াড়ের সন্ধানে এসেছি বুঝলে দাম চড়ে যাবে !
সবাই অবশ্য চিনে ফেলল...
আরে, দ্যাখ !
এ যে রয় রেস !
খেলোয়াড় খুঁজছেন বুঝি ?
হাঁ !
রটনের স্ট্রাইকার ডিনকে কিনবে !
কিংবা ওয়েস্টবেরির গোলি হপসনকে !
খেলা চলছে...
না, না, ডিনকেই কিনবে !
ডিন এগোচ্ছে !
শাবাশ !
হঠাৎ...
আটকেছি !
ফাউল ! গার্থরি ফাউল করেছে !
ওয়েস্টবেরির স্টপার-ব্যাক গার্থরি প্রতিবাদ করল...
হলুদ কার্ড !
আবার হলুদ কার্ড দেখল !
এইজন্যেই ওয়েস্টবেরি ওকে বেচতে চায় !
রয়ের ধারণা কিন্তু ভিন্ন...
ঠিক ট্যাক্‌ল করেছিল ! ফাউল হয়নি !
গার্থরিকেই কিনবে নাকি ?
(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

কুঙ্কুর জন্য কিছু একটা কিনলে হয় না ?
অবশ্য কিনলেও কুঙ্কুকে দেওয়া হবে না। আবার কবে কুঙ্কুর সঙ্গে দেখা হবে, কে জানে !
তবুও আমি কিনব। শাহজি যেমন জিজা-মার জন্য আংটি পাঠিয়েছেন —তেমনি একটা আংটি কিনব কুঙ্কুর জন্য।
যেই কথা সেই কাজ। জহুরির দোকানে গিয়ে একটা পছন্দসই আংটি কিনে ফেলে সদাশিব।
এমন সময়
আরে। সেই ছোঁড়াটা না ?
সদাশিব চমকে ফিরে দেখে...
সেই দুই বিজাপুরি ফৌজদার.... শোভান মিঞা আর হায়দার মিঞা।

চিত্রনাট্য : তরুণ মজুমদার ছবি : বিমল দাস

(এর পরে আগামী সংখ্যায়

সেই খোকন বিদেশে চলল

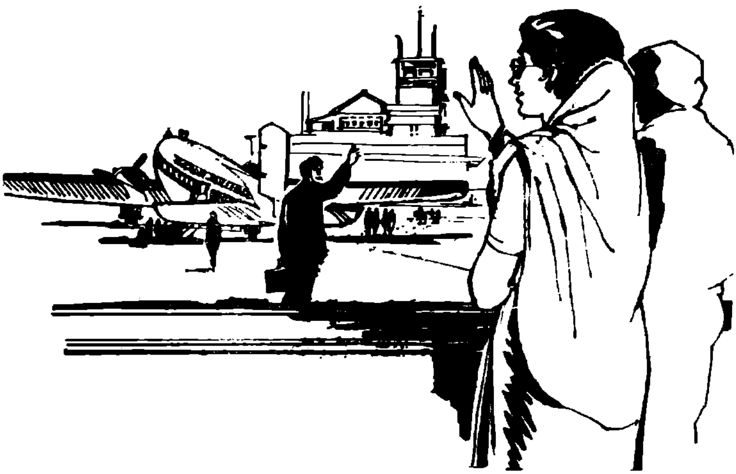

আজ বিধবা মা'র মনে পড়ে যাচ্ছে খোকনের ছোটবেলার কথা। যখন সে হামাগুড়ি দিত আর বলত— ব্বাব্বা— ম্মাম্মা। একটু বড় হয়ে বলত— হু-উ-স্ কোলে এলোপেলো কোলে তলে দাব। এ্যারোপ্লেনকে ও বলত— এলোপেলো।
আজ খোকন সত্যিই বিদেশে যাচ্ছে। এটা সম্ভব হত না যদি খোকনের বুদ্ধিমতী মা নিয়মিত টাকা না জমাতেন। জনপ্রিয় এ ব্যাপারে তাঁকে সবরকমের সুপরামর্শ দিয়েছে। জনপ্রিয় জাতির সেবায় উৎসর্গীকৃত।

জনপ্রিয় ফাইনান্স এণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ইনভেস্টমেন্ট (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড

রেজি: অফিস : [illegible] লেকটাউন, 'বি' ব্লক, কলিকাতা—[illegible] ফোন : ২৪-[illegible]
হেড অফিস : [illegible] লিটল রাসেল স্ট্রীট, কলিকাতা—৭০০ ০৭১ গ্রাম : জনভেস্ট
সেন্ট্রাল রিজিওনাল অফিস : ৪ই/১০, [illegible] নিউ দিল্লী—৫৫

অরণ্যপাঠ

শিবময় দাশগুপ্ত

খোকা কোথায় ? বনে গেছে।
বনভোজনে ? না।
ব্যাপারটা কী ? দিতে হবে
মজার পরীক্ষা।
পরীক্ষা ! সে কেমনতরো !
খুব কি কষে পড়া ?
জিওগ্রাফি, হিস্ট্রি, সায়েন্স,
অঙ্ক—ঝুঁটি-ধরা !
এসব কিছু নয়, আসলে
নতুন খেলার ধরন—
ধরো, তখন আকাশখানা
ধরেছে নীলবরন,
হঠাৎ দেখো, সাদা মেঘের
ঝাঁক এসেছে উড়ে
অঙ্কে দু'রঙ মিলিয়ে দেবার
বুদ্ধি মাথা খুঁড়ে
খুঁজবে খোকা ? কিম্বা ধরো,
মৌমাছি একঝাঁক
ফুলের বনে, মধু চুষে,
বানাল মৌচাক।
মৌমাছিদের মিষ্টি খবর
ইতিহাসে পাবে ?
তখন খোকা ছুট্টে বরং
গাছের কাছে যাবে।
প্রজাপতির সঙ্গে কিছু
গল্প-সল্প হলে
সবুজ ঘাসের শিশির জানে,
পাবে না ভূগোলে।
সূর্যাস্তের লাল গোধূলি,
নদীর জলের ঢেউ,
এসব ভাল-লাগার মানে
বিজ্ঞানে কি কেউ
খুঁজতে যাবে ? খোকা তো তাই
কেবল বনে যায় ;
বনের কাছে, মনের আলোয়,
নতুন পড়া পায়।

ছবি : নির্মলেন্দু মণ্ডল

টিনটিন বেহুঁশ ! এবারে পৃথিবীতে ফিরব !
অন্যদের না-নিয়েই ?
হ্যাঁ, তাই । ওরা মরুক !
তা হয় না ! কিছুতেই না !
দয়ামায়ার স্থান নেই ! রকেট চালাও !
না, তা আমি পারব না !
শোনো উলফ ! অক্সিজেন এতই কম যে, সবাইকে নিয়ে ফিরতে হলে আমরা সবাই মারা পড়ব !
অক্সিজেন ছিল মাত্র চারজনের । সেক্ষেত্রে আমরা যাত্রী ছিলাম সাতজন অতএব আর বাক্যব্যয় না-করে রকেট ছাড়ো !
টিনটিন আসছে !
!
?
ভৌ ভৌ ! গরর ! ঠকাস !
রকেটের মধ্যে এত শব্দ কিসের ? হ্যাল্লো টিনটিন···
উলফ বলছি । কুটুস একটু ঝঞ্ঝাট করছিল । কিন্তু এখন আবার ঠাণ্ডা হয়েছে
একদম ঠাণ্ডা !
ও কী ? কী করছ তুমি ?
লাথি মেরে এটাকে নীচে ফেলে দিচ্ছি !
এবারে কিছু খাওয়াও ! শুধু স্যাণ্ডুইচ ছাড়া এ ক'দিন কিছু খাইনি !
পেট ভরে খেয়ে রওনা দেব । বাকি সবাই চাঁদে পড়ে থাক !
কী হে, খাবার আনছ না কেন?
এক্ষুনি আনছি ।
ট্যাংক কলিং বেস !
?
একটা যন্ত্র বিগড়েছে । ক্যাপ্টেন সেটা এক্ষুনি মেরামত করে ফেলবে !

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

আজব দেশ

চন্দন মুখোপাধ্যায়

এখানে রাত্রিবেলা
বিশাল এক সূর্য ওঠে
গাছেরা থেমে থাকে না
রাস্তায় ভীষণ ছোটে।

এখানে দিনের বেলা
দেখা যায় সপ্তর্ষি
খুব কড়া অঙ্কস্যারও
হাতে নিয়ে ছিপ, বঁড়শি

ছুটে যান নদীর ধারে
ফেলে দিয়ে অঙ্কখাতা
মেঘ হলে একটু হেসে
খোলেন এক লম্বা ছাতা।

এখানে দুপুরবেলা
ওড়ে এক হলদে মাছি
জামা খুলে আদুল হলে
মেরে দেয় সব ঘামাচি।

বেড়াল আর ইঁদুর মিলে
সুতো কাটে এক চরকার
সন্ধ্যায় ক্রিকেট-মাঠে
নেমে আসে বেংসরকার

যদি খুব ইচ্ছে করে
যেতে এই আজব দেশে
চলে এসো আমার কাছে
একগাল মিষ্টি হেসে।

থাইল্যাণ্ডে

অসিতকুমার চৌধুরী

থাইল্যাণ্ডের নাম তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ। অফিসের কাজে থাইল্যাণ্ড ভ্রমণের একটা সুযোগ পেয়ে ভীষণ আনন্দ হচ্ছিল আমার।

পাশপোর্ট ও ভিসার ব্যবস্থা করে ফেললাম তাড়াতাড়ি। দুপুরের সোনা-ঝরা রোদ্দুরে থাই ইন্টারন্যাশানালের একখানা সুন্দর প্লেনে চড়ে বসলাম। ভাগ্যক্রমে জানালার ধারেই একটা সিট পেয়েছিলাম। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবরা কলকাতা এয়ারপোর্টে এসেছেন আমায় বিদায়-অভ্যর্থনা জানাতে। আমার জীবনে এই প্রথম বিমান-যাত্রা। তাই বুকের ভেতরটা দুরুদুরু করছিল ভয়ে-ভাবনায়।

আমাদের প্লেনটি চলেছে পেঁজা তুলোর মতো মেঘের ওপর দিয়ে। হঠাৎ নীচে তাকিয়ে দেখলাম—ঘর-বাড়ি, গাছ-পালা, নদ-নদী—সব যেন ভূগোলের ম্যাপ! ভয়-ভয় ভাবটা কেটে গেল যখন বিমান-সেবিকা লাঞ্চ দিয়ে হাসিমুখে 'সোয়াদি' (ধন্যবাদ) জানাল।

থাইল্যাণ্ডের রাজধানী ব্যাংককে আমরা নামলাম ভারতীয় সময়ের হিসেবে বিকেল সাড়ে তিনটেয়। ব্যাংককের সময় কিন্তু তখন বিকেল প্রায় সাড়ে চারটে। যারা ভূগোলের অংক কষো, তারা নিশ্চয়ই জানো, পূর্বদিকে গেলে প্রতি দ্রাঘিমার জন্যে চার মিনিট করে সময় বাড়বে।

ব্যাংককে গিয়ে উঠলাম সুকুমভিট রোডের উইণ্ডসর হোটেলে। হোটেলটা কী সুন্দর দেখতে। সামনে সুইমিং পুল। মনে হল, নীল জল তক-তক করছে। লাউঞ্জে গদি-আঁটা সোফা, রঙিন টেলিভিশন। সাততলার একটা কার্পেট-মোড়া

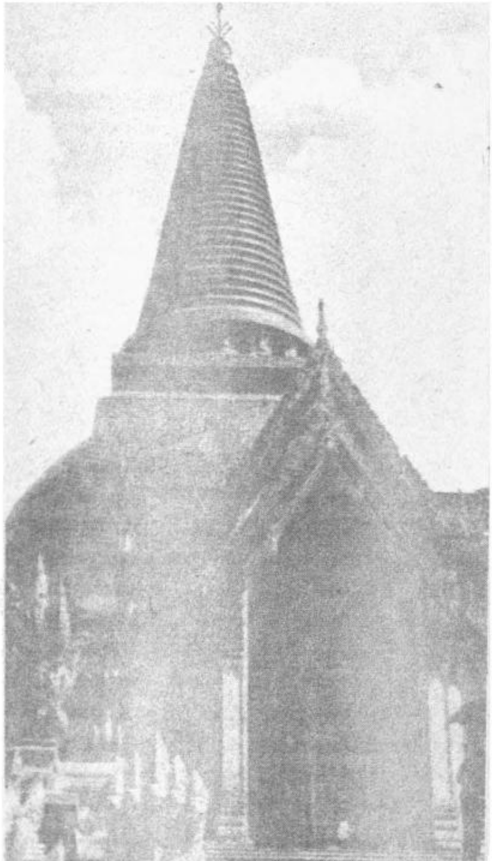

থাইল্যাণ্ডের বিখ্যাত প্যাগোডা 'ফ্রা পাথম্ ছেদি'

এয়ার-কণ্ডিশাণ্ড রুমে আমার জায়গা হল। আয়না-বসানো সুন্দর বাথরুমে স্নান সেরে শরীরটাকে ঝকঝকে করে নিলাম। তারপর বেরিয়ে পড়লাম রাস্তায়।

ব্যাংককের রাস্তা-ঘাট, দোকান-পাট বেশ সুন্দর। সাজানো-গোছানো শহর। এখানকার লোকজনও বেশ সরল ও আলাপি। হাসি এঁদের মুখে লেগেই আছে। হাসি দেখলে কার না আনন্দ হয় বলো?

প্রথম শনিবার আমরা দেখতে গেলাম থাইল্যাণ্ডের রাজপ্রাসাদ। অপূর্ব!

ব্যাংককের 'রোজ গার্ডেন', গোলাপের মেলা দেখে ফেরার পথে

রাজপ্রাসাদের মধ্যে ঢুকতে গেলে আগে থেকে অনুমতি নিতে হয়। মুভি-ক্যামেরা নিয়ে প্রবেশ নিষেধ! ১৭৮২ খ্রিস্টাব্দে থাইরাজা প্রথম রামা এই প্রাসাদ তৈরি করান।

প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে আমরা গেলাম 'স্বর্ণবুদ্ধ' দেখতে। বুদ্ধ এখানে সোনা দিয়ে মোড়া। উচ্চতা দশ ফুট, ওজন সাড়ে পাঁচ টন।

পরের রবিবার গেলাম 'সামাং লুয়াং' বা রবিবারের হাটে। রাজপ্রাসাদের সামনেই প্রতি রবিবার হাট বসে। পল্লীগ্রাম থেকে আসে রকমারি জিনিসপত্র। দামেও শস্তা।

দ্বিতীয় শনিবারে আমাদের নিয়ে যাওয়া হল শহরের বাইরে 'রোজ গার্ডেন'-এ। প্রবেশ-পথে সুন্দর সুন্দর ফুলের রাশি আমাদের সাদর সম্ভাষণ জানাল। গ্যালারিতে বসে থাইল্যাণ্ডের নানা অনুষ্ঠান দেখতে পেলাম। নাচ, গান, মোরগ-লড়াই, বক্সিং, তরবারি খেলা এবং আরো অনেককিছু। শ্যামদেশের নাচ আমাদের মণিপুরি নাচের মতোই। মোরগ-লড়াই দেখতে কী মজাই না লাগে। বক্সিং ও তরবারি খেলা থাইল্যাণ্ডে খুবই জনপ্রিয়।

অনুষ্ঠানের শেষে ওদেশের ছেলে-মেয়েরা মালা হাতে দর্শক-গ্যালারিতে উঠে এসে কয়েকজন ছেলে বা মেয়েকে বেছে নেয় ওদের সঙ্গে নাচার জন্যে। আমার গলাতেও একজন শ্যাম-কন্যা মালা পরিয়ে দিয়ে তার সঙ্গে নাচতে অনুরোধ করল। প্রায় তিন হাজার দর্শকের সামনে আমায় এক পাক নাচতে হল। তোমরা বোধহয় হাসছ, না? কিন্তু উপায় কী বলো? ওটা যে ওদেশের প্রথা!

পরের শনিবার আমরা দেখতে গেলাম

থাইল্যাণ্ডের নাক্রোন প্রদেশে অবস্থিত সবচেয়ে বড় প্যাগোডা। প্যাগোডার নাম 'ফ্রা পাথম্ ছেদি'। উচ্চতায় ৩৮০ ফুট। এর মধ্যে আছে বিশাল বৌদ্ধমূর্তি! জুতো খুলে আমরা সবাই মূর্তির দিকে এগিয়ে গেলাম ও অন্তরের শ্রদ্ধা জানালাম। থাই-বন্ধুদের মুখে শুনলাম, শ্যামদেশে ১৫০ খ্রিস্টাব্দে বৌদ্ধধর্ম প্রথম প্রচারিত হয় এই নাক্রোন পাথমেই।

প্যাগোডার ভাব-গম্ভীর পরিবেশে আধঘন্টা কাটিয়ে আমরা রওনা দিলাম রাচবুড়ি প্রদেশের ব্যাংপং শহরে শ্যাম পেপার মিলের উদ্দেশে। বেলা বারোটায় আমাদের নিয়ে যাওয়া হল সুসজ্জিত গেস্টরুমে লাঞ্চ খেতে। লাঞ্চে ছিল ভাত, সব্জি, 'ক্যাং কাই' (মুরগির মাংস), চিংড়ি, কলা, আঙুর, কুল, পেয়ারা, 'ন-য়না'(আতা) এবং নানাজাতীয় পানীয়।

পেপার-মিল দেখার পর আমরা গেলাম বিশ্ববিখ্যাত 'কুয়ে' নদীর ব্রিজ দেখতে। 'ব্রিজ অন দ্য রিভার কুয়ে' নামে একটি ইংরেজি সিনেমা এই ব্রিজকে কেন্দ্র করেই তৈরি হয়েছিল। সেতুটি কাঞ্চনাবুড়ি শহরের উপকণ্ঠে। কাঞ্চনাবুড়ি ব্যাংকক থেকে ১৩০ কিলোমিটার পশ্চিমে।

থাইল্যাণ্ডের ভাসমান বাজার দেখার মতো! 'চাও-ফ্রায়া' নদীর ওপর নৌকো করে ওদেশের কৃষকরা আনারস, আম, কমলালেবু, পেয়ারা, আতা ইত্যাদি ফল ও রকমারি সব্জি বিক্রি করে।

দেশে ফেরার আগের দিন গিয়েছিলাম ব্যাংকক থেকে ৩০ কিমি দূরে পাকনম শহরে—পৃথিবীর বৃহত্তম 'কুমির-আখড়া' দেখতে। ওখানে প্রায় দশ হাজার কুমির আছে। খালি হাতে কুমির নিয়ে খেলাও দেখানো হল।

এমনি মজা আর আনন্দের মধ্যে দিয়ে বিশ দিন কাটাবার পরে আমি উড়ে চললাম মালয়েশিয়ার পথে।

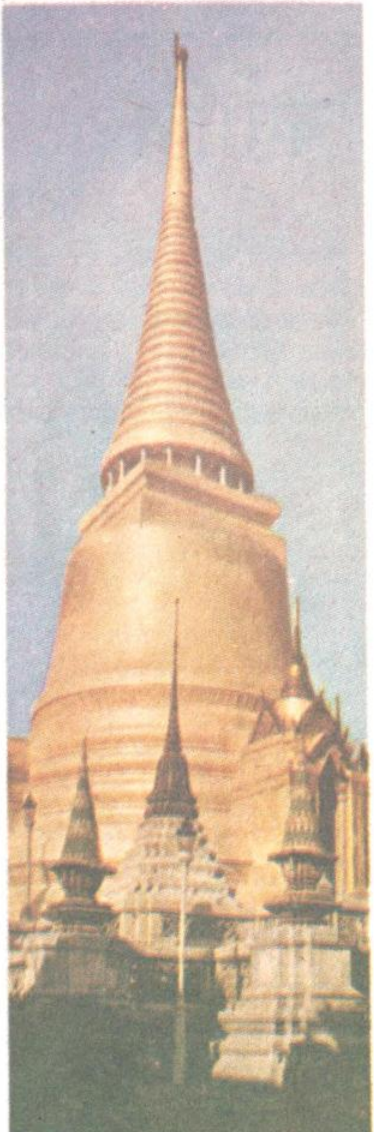

সোনালি প্যাগোডা

ক্যালিপসো-থ্রম্বোফব

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

"এটা তো জুতোর কালি। এতে আপনার এই ছড়ি পালিশ হবে কী করে?"

"যা বলেছি তাই করো। বড়দের কথা অবিশ্বাস করবে না। অবিশ্বাসী ছেলেকে বলে ঢেঁপো ছেলে।"

দাদুর পাঞ্জাবি পরা হয়ে গেছে। চোখে সোনার ফ্রেমের সেই নতুন চশমাটা উঠেছে। পাঞ্জাবির হাতায় মিহি গিলে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে পাকা চুলে বুরুশ চালাচ্ছেন। আয়নায় আমাকে দেখছেন আর কথা বলছেন।

"তাড়াতাড়ি হাত চালাও। রোদ উঠে গেলে সে বেড়ানোকে আর মর্নিং-ওয়াক

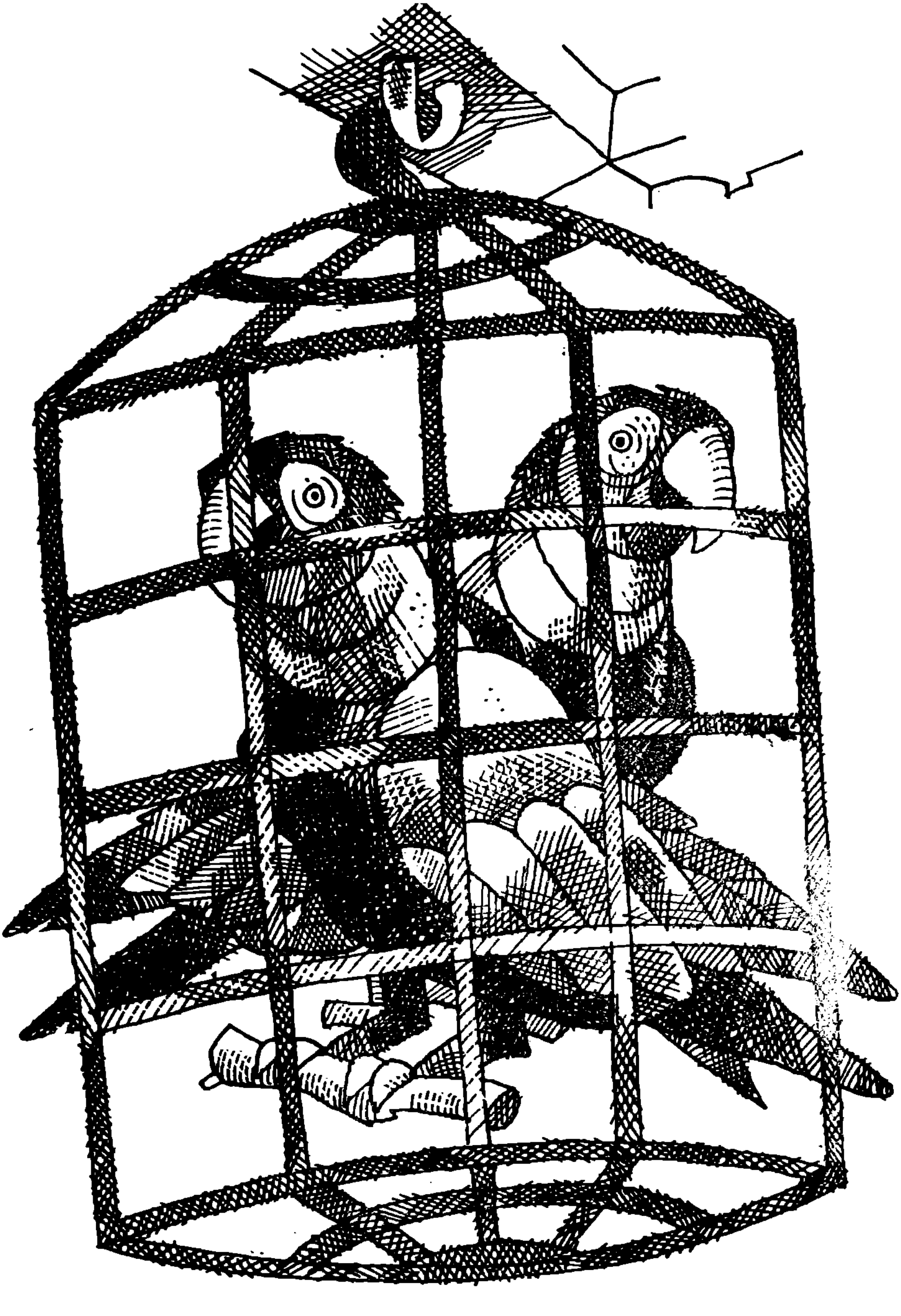

সূর্য্যের রশ্মি যখন অনবরত আপনার ত্বকের রঙ ময়লা
করতে থাকে, আপনি কি ফর্সা হতে পারেন?

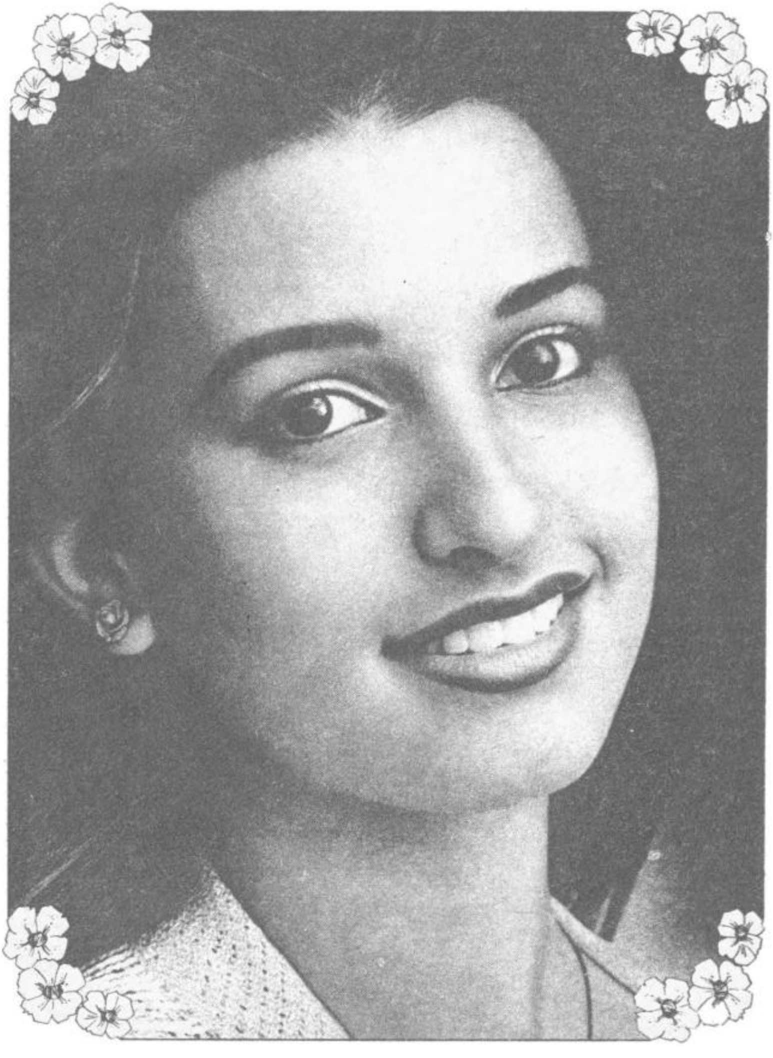

LINTAS FALOV-23 1926 BG

আপনি জন্মেছিলেন এক বিশেষ রঙ নিয়ে। কিন্তু আজ তা অনেক পর্দা ময়লা হয়ে গেছে। আপনি জানেন—সূর্যের আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মি কত চট্ করে রঙ ময়লা করে দিতে পারে। কিন্তু ওটাই রঙ ময়লা হওয়ার একমাত্র কারণ নয়! আপনার ত্বকের ভেতরে মেলানিন নামে এক রঞ্জক পদার্থ আছে, যা কিছু ত্বকে অন্যের তুলনায় অনেক বেশী ছড়িয়ে পড়ে—আর, যত বেশী ছড়িয়ে পড়ে, ত্বক তত বেশী কালো দেখায়।

রঙ ফর্সা করার কি নতুন কোনো উপায় আছে?

হ্যাঁ, আছে! এই প্রথম, বিজ্ঞানের এক নতুন আবিষ্কার—রঙ কালো করার প্রণালীকে নিয়ন্ত্রণ তো করেই, এমনকি তা বিপরীত দিকে চালনাও ক'রে। এ হল রঙ ফর্সা করার ক্রীম: ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভ্লী!

ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভ্লী কিভাবে কাজ করে?

ত্বকের ভেতরে: ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভ্লী, রঙ কালো করার প্রণালীকে বিপরীত দিকে চালনা ক'রে, ত্বকের ভেতরে স্নিগ্ধ-কোমল আর নিরাপদভাবে কাজ ক'রে আপনাকে এমন ফর্সা ক'রে যা নজরে পড়ে।

ত্বকের বাইরে: ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভ্লী-র বিশেষ 'রোদ-এড়ানোর-পর্দা', আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মিকে আটকে রঙ ময়লা হওয়া নিবারণ করে, অথচ আপনি সূর্যের যাবতীয় স্বাস্থ্যকর গুণ গ্রহণ করতে পারেন।

ফর্সা হবার জন্যে মাত্র ৬-সপ্তাহের কোর্স:

৬-সপ্তাহ নিয়মিত দিনে দুবার ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভ্লী মাখুন। প্রথমবার মাখার পর ত্বক হয়তো একটু চিন্‌চিন্ করতে পারে। এর মানে ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভ্লী কাজ করছে।
ছ'সপ্তাহের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য সবার নজরে পড়বেই।
নিয়মিত ব্যবহার করুন—আর ফর্সা হয়ে থাকুন।

ফর্সা হওয়া বা ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভ্লী সম্বন্ধে আরো কিছু জানতে হলে, এর কাছে লিখুন:

ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভ্লী অ্যাডভাইজার,
পোঃ অঃ বক্স নং ৭৫৮, বম্বে-৪০০ ০২১।

ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভলী

রঙ ফর্সা করার ক্রীম

হিন্দুস্থান লিভারের
উৎকৃষ্ট উৎপাদন

আপনাকে নজরে পড়ার মত ফর্সা করে… প্রকৃতির নিজস্ব কোমল উপায়ে!

বলা চলে না।”

“ছড়িটা অনেকদিন পড়ে থেকে থেকে ময়লা ধরে গেছে। আজ ছড়ি না-ই বা নিলেন। দুপুরে পরিষ্কার করে রাখব, কাল থেকে নিয়ে বেরোবেন।”

বুরুশ রেখে দাদু ঘুরে দাঁড়ালেন, “কাজকে অত ভয় পাও কেন ? হাতে ছড়ি থাকলে ইজ্জত বাড়ে, জানো কি তা ? ওই আগরওয়ালের পাশে খালি হাতে ঘুরলে নিজেকে বড় ছোট মনে হয়। তোমার দাদুরও একটা প্রেসটিজ আছে।”

নেপাল এয়ারলাইন্সের কী একটা মামলা জিতিয়ে দিয়ে দাদুর খুব নামডাক হয়েছে। পুরনো গাড়ি বিদায় করে চাঁপাফুল রঙের নতুন একটা গাড়ি কিনেছেন। মাঝে মাঝে কোঁচার খুঁট কি রুমাল দিয়ে দরজার হাতল পালিশ করেন। বনেট চকচকে করে মুখটা চট করে একবার দেখে নেন।

প্রসাদদা স্টিয়ারিংয়ে মাথা রেখে মনে হয় ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। ভোরের ঘুম এখনও চোখে লেগে আছে। আমারও মাঝে মাঝে হাই উঠছে। ভোরের এই ফুরফুরে ঠাণ্ডা হাওয়ায় ঘুমটা যা জমত না ! দাদুর এই বেড়ানো যে আর ক'দিন চলবে ! পারা যায় না।

ছড়ির ডগা দিয়ে দাদু প্রসাদদার মাথার পিছনে টুক করে মারলেন। “চলো হে প্রসাদচন্দ্র। পুব আকাশে লাল রঙ ধরেছে। আজ এই ব্যাটার জন্যে পনেরো মিনিট লেট হয়ে গেল। গোয়েঙ্কার এতক্ষণে একশো পাক মারা হয়ে গেল !”

“গোয়েঙ্কা নয় দাদু, আগরওয়াল।”

“তুমি আমার চেয়ে বেশি জানো ?”

“একটু আগে আপনিই বললেন আগরওয়াল।”

“আরে, নামে কী এসে যায় ! আসল হল মানুষ। তোমাকে হুলো বললেও যা, গবা বললেও তাই। সেই এক দুর্দান্ত, অশান্ত, ছটফটে ছেলে। প্রসাদ, গাড়ি আজ এত আস্তে চলছে কেন ?”

“আজ্ঞে, ভোরবেলা তো, তাই একটু ঝিম মেরে গেছে। এখনও ভাল করে ঘুম ছাড়েনি।”

“চা খেয়েছ ?”

“আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি খেয়েছি।”

“তার মানেই গাড়ি খেয়েছে। এইবার একটু ফুর্তিসে চালাও।”

ইডেনের পাশ দিয়ে গাড়ি গঙ্গার ধারে একেবারে ফোর্টের কাছে চলে এল। ভিজে-ভিজে ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। দূর থেকে দেখতে পাচ্ছি বেশ মোটামতো একজন ভদ্রলোক ঢালু সবুজ মাঠের ওপর তালে তালে ছুটছেন। ভুঁড়ি নাচছে। গালের থলথলে মাংস নাচছে। এখানে মোটারা রোগা হতে আসেন। যাঁদের বাত আছে তাঁরা বাত সারাতে আসেন।

গাছতলায় গাড়ি দাঁড়াতেই দাদু নেমে পড়লেন। বেড়াবার জন্যে প্রাণ যেন ছটফট করছে। আমার দাদুর আজকাল খুব সুখ হয়েছে। যত দুঃখ আমার। বছরে চার-পাঁচবার পরীক্ষা দিতে হলে কার আর সুখ থাকে !

ছড়িটাকে বারকয়েক বাতাসে গোল করে ঘুরিয়ে হাওয়া খাইয়ে নিলেন। আন্দামান থেকে ছড়িটা দাদুর এক বন্ধু এনে দিয়েছিলেন। প্যাডক কাঠের তৈরি। প্যাডক আবার কী কাঠ, কে জানে বাবা ! দাদু চারপাশে চোখ বুলিয়ে বললেন, “কই, আমার ফ্রেণ্ড ঝুনঝুনওয়ালাকে তো দেখছি না আজ ?”

“ঝুনঝুনওয়ালা নয় দাদু, আগরওয়াল।”

“ওই হল রে বাবা।”

লম্বা-লম্বা পা ফেলে দাদু হাঁটা শুরু করলেন। এত জোরে হাঁটছেন যে আমাকে ছুটতে হচ্ছে। ইস্টবেঙ্গল টেন্টের দিকে ধাওয়া করেছেন। আরও অনেকে এসেছেন। সকলেরই কাজ জোরে জোরে হাঁটা। চেনা কেউ উল্টো দিক থেকে পাক

মেরে ফেরার সময় মুখোমুখি হলে শুধু একটু মুচকি হাসা। কথা বলারও সময় নেই। মনে মনে শুনতে হবে পাকের সংখ্যা—এক পাক, দু পাক…।

প্রথম পাক মেরে ফেরার সময় রোজের অভ্যাসের মতোই দাদু বাঁ দিক ঘেঁষে আসছিলেন। কাঁটাতারের বেড়া, ঝোপঝাড়। শুরু হয়েছে ফোর্টের নিজস্ব এলাকা। পরিখা রয়েছে, জল নেই। জায়গাটা দেখলেই দিনের বেলাতেও গা ছমছম করে। কেবল গাছ আর গাছ।

মাটির দিকে মুখ নিচু করে দাদু হঠাৎ থমকে পড়লেন, "এ কী?"

মাটিতে, ঝোপের ধার ঘেঁষে একটা চশমা পড়ে আছে। নতুন চশমা। আমাকে বললেন, "তোলো।" নিচু হয়ে চশমাটা তুলতে গিয়ে দেখি, ঝোপের মধ্যে সোনালি আর একটা কী চকচক করছে। ছড়ি দিয়ে টেনে জিনিসটাকে বের করে আনলেন দাদু। ছোট্ট একটা ডায়েরি। চারটে কোণ পেতল দিয়ে মোড়া।

"নাও তোলো।"

নোটবুকটা দাদুর হাতে দিলুম। হাতে নিয়েই বললেন, "ভিজে ভিজে ঠেকছে। সারা রাত এই ঝোপে পড়ে ছিল। শিশির লেগে গেছে।"

"গরমকালে শিশির পড়ে দাদু?"

"তক্ক কোরো না। সব কালেই রাতে একটু না একটু শিশির পড়ে। রাতের খবর তুমি কতটুকু রাখো হে খোকা! দশটা বাজতে না বাজতেই ভোঁস-ভোঁস ঘুম।"

"আপনি আজকাল ভীষণ ঝগড়া করেন।"

"ঝগড়া! তোমার সঙ্গে ঝগড়া! একে ঝগড়া বলে? ঝগড়া কাকে বলে তাই জানিস না। তুই দেখছি গোরুর চেয়ে গাধা।"

বাবা! সে আবার কী জিনিস! গোরুর চেয়ে গাধা? গোরু আবার কবে গাধা হল? না বাবা, তক্ক করব না। আবার গালাগাল খেতে হবে।

দাদু বললেন, "ব্যাপারটা খুব ফিশি মনে হচ্ছে। আয় নির্জনে কোথাও একটু বসি।"

"ফিশি মানে কী দাদু? আঁশটে?"

"তোমাকে এখন ইংরিজি শেখাবার সময় আমার নেই। ফিশ থেকে বিশেষণ করে ফিশি, মাঝে মাঝে ডিকশনারিটা তো ওলটাতে পারো। বাড়িতে তো বইয়ের অভাব নেই।"

দূরে একটা গাছতলায় আমরা দু'জনে পাশাপাশি বসলুম। রোদ ফুটছে ধীরে ধীরে। কী সুন্দর দিন। সামনে ফোর্ট, পরিখা, লম্বা-লম্বা ছায়া। অনেক দূরে খাঁকি রঙের একটা মিলিটারি ভ্যান চলে যাচ্ছে। ঘোড়ায় চেপে একজন পুলিশ চলেছে। সাদা প্যান্ট আর গেঞ্জি পরে তিনজন খেলোয়াড় সমান তালে ছুটছেন।

দাদু নোটবুকটা খুললেন। প্রথম পাতাতেই নাম আর ঠিকানা। বিপুলকিরণ চৌধুরি। আলিপুর রোড। ফোন নম্বর। আরো সব নানা রকম নম্বর লেখা। গাড়ির লাইসেন্স নম্বর। ইনসিওরেন্সের পলিসি নম্বর। পরের কয়েকটা পাতা সাদা। তারপরে একটা পাতায় লেখা, "সত্য আর কতদিন গা ঢাকা দিয়ে থাকবে?" আবার সাদা পাতা। তারপর হঠাৎ লেখা, "ধরি ধরি করি ধরিতে না পারি।" শেষ লেখা, "আজ মাঝরাতে যা থাকে বরাতে।"

দাদু আমার মুখের দিকে তাকালেন, "কী বুঝলে?"

"ফিশি।"

"অ্যা, ঠিক বলেছ।"

"ওই মাঝরাতেই মরেছেন। ডেডবডিটা মনে হয় কাছাকাছি কোথাও আছে। হয়তো ওই পরিখার ভেতরে।"

"গবেট। কেসটা তোমার মাথায় ঢোকেনি। বিপুলবরণ…"

"বিপুলকিরণ দাদু।"

ওই হল রে বাবা। বিপুলবাবু একজন ধনী মানুষ। তিনি সত্যসাধনকে টাকা ধার দিয়েছিলেন। সেই সত্য ব্যাটা পালিয়ে বেড়াচ্ছে। তাকে হঠাৎ এখানে দেখতে পেয়ে বিপুলবাবু ধরতে ছুটেছিলেন। ধরি ধরি করি ধরিতে না পারি। দুম করে পড়ে গেলেন। চশমা চোখ থেকে ছিটকে চলে গেল। নোটবুক বুকপকেট থেকে পড়ে গেল। সবাই ধরাধরি করে হসপিটালে নিয়ে গেল। এই দুটি জিনিস কারুর চোখে পড়ল না। বুঝলে কিছু?"

"আজ্ঞে না। এই লেখাগুলো কি তাহলে ঘটনা ঘটে যাবার পর? আবার লেখা রয়েছে মাঝরাত। আপনি দাদু একদম ধরতে পারেননি।"

"ইয়েস, ঠিক বলেছ। আমিই একটি গবেট। তোমার তাহলে কী মনে হয়?"

"এটা মার্ডার কেস। যে-কোনও কারণেই হোক ভদ্রলোক মাঝরাতে এখানে এসেছিলেন, সেই সময় চ্যাক।"

"চ্যাক, সে আবার কী?"

"চ্যাক করে ছুরি। ঠিকানা যখন রয়েছে তখন চলুন না ভদ্রলোকের বাড়িতে একবার যাই। জিনিসদুটো ফেরত দেওয়া যাবে। কিছু ঘটে থাকলে জানাও যাবে।"

"অল রাইট। চলো তা হলে।"

॥ দুই ॥

বিশাল বাড়ি। কিন্তু কেমন যেন ভুতুড়ে মার্কা। বড় গাছ, ছোট গাছ, সব একসঙ্গে জড়ামড়ি। বাইরে থেকে বাড়িটার কিছু-কিছু অংশ চোখে পড়ে। গাড়িবারান্দা, তার ওপর লাল টালি-ছাওয়া একটা ছাদ। দোতলার একটি অংশ চোখে পড়ার মতো, যেন হাওয়া-মহল, বাতাসে ঝুলছে। বাড়ির বিশাল গেটটি কিন্তু বন্ধ। বোম্বাই চেহারার তালা ঝুলছে।

দাদু আমার দিকে অদ্ভুত মুখে তাকালেন। জানি, বেশ কড়া কিছু

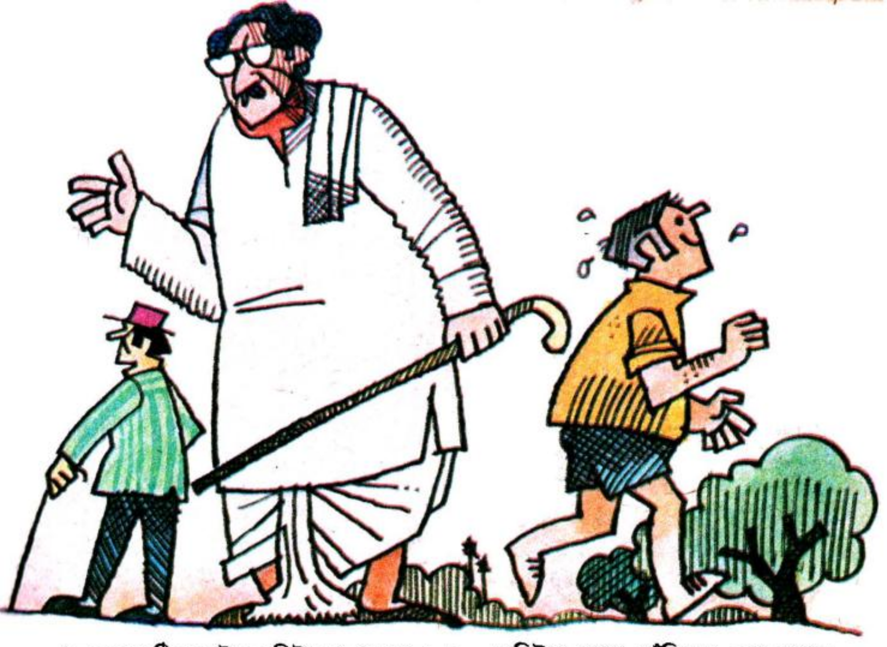

বলবেন। ঠিক তাই। ছড়িটা তালার গায়ে ঠেকিয়ে, শব্দ করে বারকয়েক দুলিয়ে বললেন, "তোমার কথা শুনে কিছু করলেই বড় ভুগতে হয়। সকালের বেড়ানোটা গেল। কমলালেবুর রস খাওয়ার সময় চলে গেল।"

"কমলালেবুর রস ? এখন কমলালেবু পাবেন কোথায় ?"

"সেটা আমার ভাবনা নয়। অ্যামেরিকায় বড় বড় লোকেরা সকালে কমলালেবুর রস খায়। আমিও খাব আজ থেকে। হরিদাসকে আমি বলে এসেছি। মাথাব্যথা তার।"

"এখন তাহলে আমাদের কী করা উচিত দাদু ?"

"বলো, তোমার হুকুমেই তো চলছি। আচ্ছা, আশেপাশে একটু খোঁজখবর করলে হয় না ? কাঠের নেমপ্লেটের নামটা তো ঝাপসা অস্পষ্ট হয়ে গেছে ; কিছুই তো পড়া যাচ্ছে না।"

বাড়িটার পাশে, পাঁচিলের শেষ মাথায় ছোট্ট একটা ঘর। কোনও কালে এই বাড়িরই আউট-হাউস ছিল। সামনের দিকে দরজা ফুটিয়ে এক ধোবিকে ভাড়া দেওয়া হয়েছে। তোলা উনুন গনগন করছে। দুটো ইস্ত্রি চাপানো রয়েছে। দড়িতে সার সার ভিজে ভিজে শাড়ি ঝুলছে। গাঁট্টাগোট্টা একটি লোক মল্লবীরের মতো ইস্ত্রি করে চলেছে। ভিজে জামা থেকে ইস্ত্রির উত্তাপে বাষ্প উঠছে। হাসা উচিত নয়, তবু হাসি পেয়ে যাচ্ছে, লোকটির মাথায় ইয়া মোটা একটা টিকি, কাজের তালে তালে ডাইনে বাঁয়ে দুলছে। ডগায় আবার কায়দা করে একটা কলকেফুল বাঁধা হয়েছে।

দাদু আমার সামনে দুটো আঙুল বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, "যে-কোনও একটা ধরো।"

খপ করে মাঝের আঙুলটা চেপে ধরলুম।

দাদু বললেন, "বাংলা।"

"তার মানে ?"

"বাংলায় প্রশ্ন করব, না হিন্দিতে, ঠিক ধরতে পারছিলুম না; তাই লটারি করলুম।"

লোকটিকে অনেক প্রশ্ন-ট্রশ্ন করে যা জানা গেল, তা অনেকটা গল্পের মতো। বাড়িতে একজন মাত্র মানুষ থাকেন, তাঁর নাম বিপলবাবু। দাদু বললেন, "ঠিক আছে, পু আমরাই করে নিচ্ছি উ লাগিয়ে।"

তা সেই বিপলবাবু বড় মজার মানুষ। বড় বড় চুল, দাড়ি, গোঁফ যেন তুলসীদাসজি! কখনও প্যান্ট-কোট পরেন, কখনও শেরোয়ানি, কখনও আলখাল্লা। লোকজন বাড়িতে খুব কমই আসে। মাঝে মাঝে খুব লম্বামতো বুড়ো এক সায়েব আসে। খাস-বিলিতি সায়েব। খুব পুরনো আমলের একটা মোটরগাড়ি আছে। সে রকম গাড়ি এখনকার কালের রাস্তায় চলে না। দুপাশে পাদানি, টেপা হর্ন, ইয়া তার চোঙা। শব্দ হয় ভ্যাঁক, ভ্যাঁক। কোনও কোনও দিন অনেক রাতে গাড়িটা গেট খুলে রাস্তায় নেমে আসে পাগলের মতো। পেছনের লাল আলোটা এত জোরে জ্বলে, যেন আগুন পড়ছে গলে গলে, টিকিদার তাই মনে হয়।

আমার দাদু, আইনের মানুষ বাবা! তাঁর অন্য কথা মনে হবে আমি জানতুম। দূরে পার্ক-করে-রাখা গাড়ির দিকে এগোতে এগোতে বললেন, "মানুষ কেন যে আজকাল এত নেশা করে? সব সময় নেশায় টং হয়ে আছে। গাঁজার ধোঁয়ায় সব লাল দেখছে। গাড়ি লাল, আলো লাল, পৃথিবীটাই লাল।"

গাড়ি চলতে শুরু করল। প্রসাদদা দুটো জিনিস মনে হয় ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও পারে, গাড়িতে স্টার্ট দেওয়া, আর স্টার্ট বন্ধ করা।

ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলুম, "জিনিসদুটো তাহলে কোথায় জমা দেবেন? থানায়?"

"না, আমার কাছেই থাকবে। সশরীরে যোগাযোগ সম্ভব না হলেও, বিজ্ঞানের যুগে কণ্ঠস্বরে যোগাযোগ তো হতে পারে। সারাদিন টেলিফোনে সেই চেষ্টাই চলবে।"

কাপড়-জামা না পালটে দাদু প্রথমেই বসার ঘরে টেলিফোন-ডাইরেকটরি নিয়ে পড়লেন। বইটা খুললেই মেজাজ সপ্তমে চড়ে যায়। খুদে খুদে অক্ষর, লাখ-লাখ নাম। পাতা ওলটাচ্ছেন আর বলছেন, "যেমন দেশ, তার তেমন ব্যবস্থা।"

হরিদাসদা এক গেলাস লেবুর জল আর ছোট্ট একটা রেকাবিতে বড় এক কোয়া রসুন এনে পাশে রাখলেন। এ আবার কী ধরনের খাওয়া? অ্যামেরিকান? "মানুষ বড়লোক না হইলে পাগল হয় না।" কার উক্তি? আমার। "মানুষ বৃদ্ধ না হইলে সুন্দর হয় না"-র নকলে এই মাত্র তৈরি করে ফেললুম। আমার কী প্রতিভা! জুভিনাইল ট্যালেন্ট। আমাদের পাড়ায় সাত বছরের একটি ছেলে সাংঘাতিক তবলা বাজায়। দাদু যখনই তার প্রশংসা করেন, তখনই বলেন ওই ইংরিজিটা।

"জয় বাবা ধন্বন্তরি"—লেবুর জল দিয়ে রসুনের কোয়াটা কোঁত করে গিলে ফেললেন। দম নিয়ে বললেন, "জয় বাবা বাত-হরা, হৃদয়-হরণ রসুনায় নমঃ।"

রসুন আর পাতিলেবু এক সঙ্গে শরীরের শক্তি বাড়িয়ে দিয়েছে। ডাইরেক্টরিটাকে রাগের চোটে তছনছ করে, আমার দিকে ছুঁড়ে দিলেন। দুম করে সোফায় এসে পড়ল ডানা-ছ্যাতরানো জটায়ুর মতো।

"তুমি একবার চেষ্টা করে দ্যাখো। নবজাতকের দৃষ্টি চাই ওই জরদ্গব থেকে কিছু পেতে হলে!"

সময়টা আমার খুব ভালই যাচ্ছে বলতে হবে। এক চান্সেই নম্বরটা পেয়ে গেলুম। নাম, ঠিকানা সব মিলে গেছে। দাদু বললেন, "নম্বরটা লিখে রাখো। ঘণ্টাখানেক পরেই ফোন করা যাবে। তবে ফোন করে লাভটা কী হবে! চশমা আর

নোটবুকের মালিককে কি পাওয়া যাবে ? তিনি কি আর এ-জগতে আছেন ?"

দাদু লাইব্রেরি ঘরের দিকে চলে গেলেন। এইবার সব বড়-বড় মক্কেলদের আগমন হবে। দাদু চলে যেতেই আমি টেলিফোনটা ভয়ে ভয়ে তুলে নিলুম। নম্বরটা ডায়াল করতেই বাজতে শুরু করল। কেমন যেন গা ছমছম করছে। অজানা জগতে শব্দ ধাক্কা মেরে মেরে কাউকে জাগাতে চাইছে। বলা যায় না তিনি হয়তো মৃত। পুরনো আমলের বড়-বড় বাড়িতে, অদ্ভুত-অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটে।

রিসিভার তুলে নিলে যেরকম শব্দ হয়, সেই রকম একটা শব্দ হল। বাজনা থেমে গেল। উত্তেজনায় আমার শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে। কাঁপা-কাঁপা গলায় বললুম, "হ্যালো, হ্যালো।"

সাড়াশব্দ নেই, তবে রিসিভার যে তোলা হয়েছে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কাকের ডাক, ম্যাকাও পাখির ডাক শুনতে পাচ্ছি। অদ্ভুত আর একটা আওয়াজও শুনতে পাচ্ছি, যেন ঝোড়ো বাতাস বইছে সাঁ-সাঁ করে। আর একবার হ্যালো বললুম। এবার আমার ভীষণ ভয় করছে। কিসের ভয় তা বলতে পারব না। বহুদূরে নির্জন কোনও বাড়িতে ফোন বাজছে, আমার মনে হচ্ছে একা একা আমি সেই ষড়যন্ত্রের জগতে ঢুকে পড়ে আর বেরোতে পারছি না।

চিৎকার করে ডাকলুম, "দাদু।"

ছুটে এলেন। রিসিভারটা দিয়ে বললুম, "ওই বাড়ি, বেশ রিং করছিল ! রিসিভার কেউ তুলেছেন, কিন্তু সাড়া দিচ্ছেন না। শুনুন।"

কানে রিসিভার লাগিয়ে দাদু অনেকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন। বেশ জোরে জোরে বললেন, "হ্যালো, হ্যালো।" তারপর বিরক্ত হয়ে ফোনটা নামিয়ে রাখলেন ঝড়াং করে।

"তোমার যেমন কাণ্ড, কী ডায়াল করতে কী ডায়াল করেছ। ক্রস কানেকশান হয়ে বসে আছে।"

রিসিভারটা তুলে নিলেন। খুব রেগে রেগে ট্যাপ করতে লাগলেন। বারবার নামালেন, ওঠালেন। জিরো ডায়াল করলেন, নাইন নাইন ঘোরালেন। শেষে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "ফোনটাকে কী করে দিলে তুমি ? কার মধ্যে দিয়ে কী ঘুরিয়ে দিলে !"

"যেমন ঘোরায় সেই ভাবেই ঘুরিয়েছি দাদু। অন্য কোনও ভাবে ঘোরাইনি। একটাই তো চাকা ! চাকার মধ্যে তো আর চাকা নেই !"

"দ্যাখো চেষ্টা করে যদি জট ছাড়াতে পারো। একই সঙ্গে পাখি ডাকছে, তার মানে লাইনের একটা মাথা গিয়ে ঢুকেছে চিড়িয়াখানায়, আর একটা মাথা মনে হয় কারুর ফুসফুসে ঢুকেছে, যে-রকম সাঁই-সাঁই শব্দ হচ্ছে।"

দাদু নিজের কাজে চলে গেলেন। আমারও পড়া আছে। চশমা আর একটা নোটবুক নিয়ে মাথা খারাপ করলে পরীক্ষার ফলও খারাপ হবে। চশমা আর নোটবুক টেবিলের ওপর পড়ে রইল।

মাঝে-মাঝে টেলিফোন তুলে দেখা হতে লাগল, যদি ঠিক হয়ে গিয়ে থাকে। কোথায় কী ! সেই এক পাখির ডাক, আর সাঁ-সাঁ বাতাসের শব্দ। সারা দিনে ফোন আর ঠিক হল না। বিকেলের দিকে দাদু বললেন "আমার কর্তব্যজ্ঞান কী বলছে জানো হুলো জিনিসদুটো নিয়ে অবিলম্বে আলিপুর থানায় গিয়ে অভয়চরণকে সব বলা। ব্যাপারটা খুব..."

"আজ্ঞে হ্যাঁ, ফিশি মনে হচ্ছে।"

"ভেরি গুড। মনে রেখেছ তাহলে। গেট রেডি। চলো তাহলে বেরিয়ে পড়া যাক।"

প্রসাদদার এখন দুটো কাজ, হয় গাড়ি

মোছা, আর না' হয় গাড়ি চালানো। কথায়-কথায় আফসোস করেন, ব্যাক গিয়ারটা এখনও তেমন সড়গড় হল না।

থানার সামনে বিশাল ভিড়। দাদু প্রসাদদাকে বললেন, "গাড়িটা একটু দূরে দাঁড় করাও। গণবিক্ষোভ চলেছে! কোথাকার জল কোথায় গড়াবে কে জানে!"

দাদুর বন্ধু অফিসার-ইন-চার্জ অভয়চরণবাবুকে একদল ঘিরে ফেলেছেন। জনতা চেল্লাচ্ছে, তিনিও চেল্লাচ্ছেন, তারস্বরে বলছেন, "আচ্ছা মুশকিল, এর আমি কী করতে পারি?"

জনতা বলছে, "নিশ্চয় পারেন, আলবত পারেন, আপনার হাতে আইন আছে।"

দাদু দু'বার কাসলেন। সেই বিখ্যাত কাসি, যা শুনে এজলাসে জজসাহেবও তটস্থ হন। এ কাসি, কাসির কাসি নয়, দৃষ্টি আকর্ষণের শব্দ। জনতা চুপ হয়ে গেল।

দাদু বললেন, "অভয়চরণ, ব্যাপারটা কী! একেবারে মেছোহাটা বসিয়ে ফেলেছ!"

"এই যে স্যার আপনি এসে গেছেন? নমস্কার, নমস্কার।" অভয়বাবু দাদুকে নমস্কার করতেই, জনতাও নমস্কার ঠুকে দিল।

দাদু এবার জনতার উদ্দেশে বললেন, "কী হয়েছে, কী? সমস্যাটা কী?"

জনতা কিছু বলতে যাচ্ছিল, সকলে একসঙ্গে, অভয়বাবু হাতের ইশারায় থামিয়ে দিয়ে বললেন, "সে এক পিক্যুলিয়ার কেস। মানুষের মাথা বটে। এক বাড়িওলা ভাড়াটে উচ্ছেদের জন্য করেছে কি, বিশ-বাইশটা লেড়ি কুকুর এনে পাশের ঘরে পুরে দরজায় তালা মেরে দিয়ে সরে পড়েছে। এইবার সেই বিশটা কুকুর বিশরকম সুরে অষ্টপ্রহর ডেকে চলেছে। এঁরা বলছেন, ভাড়াটে বেচারা তো পাগল হয়েইছে, সেই সঙ্গে সারা পাড়া পাগল হতে চলেছে। এ

সমস্যার আমি কী করতে পারি ! ভদ্রলোক বে-আইনি তো কিছু করেননি। কুকুর পোষার কনস্টিটিউশানাল রাইট সকলেরই আছে।"

"শোনো শোনো অভয়চরণ, সংবিধান অধিকার যেমন দিয়েছেন, তেমনি অধিকারের অপব্যবহার সম্বন্ধেও সাজার ব্যবস্থা রেখেছেন। ভদ্রলোকের উদ্দেশ্য কুকুর পোষা নয়, মানুষকে উত্ত্যক্ত করা। তুমি পাঁচ-আইনে কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে এসো, তারপর আমি ঘানি ঘুরিয়ে ছেড়ে দোব।"

জনতা চিৎকার করে উঠল, "যুগ যুগ জিও।"

এক কথায় থানা সাফ। অভয়বাবু সেকেণ্ড অফিসারকে বললেন, "একটা হুলিয়া বের করে লোকটাকে পাকড়াও করে আনো, আর তালা ভেঙে…।"

দাদু বললেন, "না, না, তালা ভেঙো না, ওইটাই তো প্রমাণ।"

ঝামেলা মিটে গেল। দাদু এবার নিজের কেস পাড়লেন, "অভয়চরণ, ব্যাপারটা বড় মিস্টিরিয়াস। এই চশমা আর নোটবুকটা আজ সকালে আমি ফোর্টের পাশ থেকে কুড়িয়ে পেয়েছি। নোটবুকের ঠিকানা দেখে সকালে আমরা দুজনে আলিপুর রোডে গিয়েছিলুম, বুঝলে ! বিশাল বাড়ি। ফটকে তালা ঝুলছে। পাশেই এক ধোবির ডেরা। সে আমাকে গল্প শোনাল, তাতে মনে হচ্ছে বাড়িটাও খুব মিস্টিরিয়াস। ইতিমধ্যে আমরা ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করি। সেও এক রহস্যময় ব্যাপার। ফোন বাজল। কেউ একজন রিসিভারও তুলল, ব্যস, সব খতম। সেই থেকে আমাদের ফোনে কেবল পাখির ডাক আর সাঁই-সাঁই শব্দ শোনা যাচ্ছে। তুমি একবার চলো অভয়চরণ।"

"আপনি মুকুজ্যেমশাই একটা না একটা ব্যাপারে বেশ জড়িয়ে পড়েন। তারপর

কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরোয়।"

"আহা আমার কী অপরাধ বলো! সকালে ফোর্টের ধারে বেড়াতে গিয়ে যদি পেয়ে যাই, কী করে চোখ বুজিয়ে চলে আসি!"

"দাঁড়ান, এখুনি যাব। টক করে এক চুমুক চা মেরে নি..।"

বেশ বড়-সড় কাপে তিন কাপ চা, আর গরম গরম শিঙাড়া এল। বেশ ভালই জমল। বাড়িতে আমি চা খাই না। এখন আমি দাদুর অ্যাসিস্টেন্ট, মানে সমানে সমান। কিছুক্ষণের মধ্যেই দলবল তৈরি হয়ে গেল। অভয়বাবু আমাদের গাড়িতেই উঠলেন। আগে চলেছে জিপ, পেছনে আমাদের গাড়ি।

বাড়ির সামনে এসে আমরা নেমে পড়লুম। সেই একই তালা ঝুলছে। ধোবি বললে, সে কাউকে ঢুকতেও দেখেনি, বেরোতেও দেখেনি।

অভয়বাবু বললেন, "আপনি বলছেন ফোন রিং করেছিল, রিসিভার কেউ তুলেছিল, কিন্তু সাড়া দেয়নি। তারপর রিসিভারটাও আর ঠিকভাবে নামিয়ে রাখেনি, যার ফলে আপনার ফোনে পাখি ডাকছে। তার মানে ব্যাপারটা খুব···।"

আমি বললুম, "ফিশি।"

"ঠিক বলেছ, ভীষণ ফিশি। তাহলে তালা ভেঙে ঢুকতে হয়।"

দাদু বললেন, "অবশ্য। রহস্যপুরীর ভেতরে কী হচ্ছে, আমাদের দেখতে হবে। দিনকাল আর আগের মতো নেই।"

পুলিশের হাতে তালা। এক চাড়ে খোল-নলচে সমেত ঠিকরে বেরিয়ে এল। চাকা লাগানো বিশাল গেট একটু ঠেলতেই হাট খুলে গেল। সামনেই একটা মার্বেল পাথরের স্ট্যাচু। একজন মহিলা ডিসকাস ছোঁড়ার জন্য চিরপ্রস্তুত। বিশাল-বিশাল গাছ কলকাতার অপরাহ্নের আকাশ মাথায় করে রেখেছে। অজস্র পাখি ডাকছে, আর ডাকছে সেই ম্যাকাও।

অভয়বাবু বললেন, "ব্যাপারটা কী!"

"ভৌতিক, স্রেফ ভুতুড়ে ব্যাপার। বাড়ি আছে, জনপ্রাণী নেই।" দাদু উত্তর দিলেন।

অভয়বাবু বললেন, "নিজেকে ঠিক চোরের মতো মনে হচ্ছে। এখুনি দুম করে পেছন থেকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে, কে? কাকে চাই? হাত ফসকে পুলিশের এই ব্যাটনটা পড়ে যাবে।"

দাদু বললেন, "ঠিক বলেছ, আমরা কী রকম চোরের মতো পা টিপে টিপে হাঁটছি দেখেছ!"

নীচের তলা, ভোঁ-ভাঁ। আর একটি মাত্র ঘর দেখতে বাকি। নীচের সব ঘরই বেশ সাজানো-গোছানো, বড়-সড়। এই ঘরটি সবচেয়ে বড়। আর একমাত্র এই ঘরেরই দরজায় একটা পর্দা ঝুলছে। অভয়বাবু পর্দা সরাতেই আমরা চমকে উঠলুম। দরজার দিকে পেছন করে আরাম-কেদারায় বসে আছেন বিশাল এক পুরুষ। এক মাথা ধবধবে সাদা চুল।

অভয়বাবু জিজ্ঞেস করলেন, "আসতে পারি?"

কোনও উত্তর নেই। এমনকী মাথা ঘুরিয়ে তাকালেন না পর্যন্ত। অভয়বাবু তখন ইংরেজিতে জিজ্ঞস করলেন, "মে আই কাম ইন স্যার?"

উত্তর নেই। দাদু বললেন, "হি ইজ ডেড। মার্ডার। আর হবে না, এত বড় বাড়িতে কোনও মানুষ বেশিক্ষণ থাকতে পারে? ভয়েই মারা যাবে।"

আমরা চুপি চুপি ঘরে ঢুকলুম। অভয়বাবু বললেন, "ঘুমিয়ে পড়তেও পারেন।"

সামনে গিয়ে আমরা বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেলুম। মানুষ নয়, মানুষের মূর্তি। অভয়বাবু বললেন, "অসাধারণ, কে এমন নিখুঁতভাবে তৈরি করেছেন বলুন তো!

একেবারে ভড়কে দিয়েছে!"

"নিশ্চয়ই কোনও ইতালীয় শিল্পী।"

"আঃ, একটা হাতের কাজ বটে।" অভয়বাবু মূর্তিটার মাথায় একবার হাত বোলালেন।

দাদু বললেন, "টেলিফোনটা তাহলে কোথায়, কোন ঘরে আছে?"

"দোতলায় থাকতে পারে।"

"এত বড় একটা বাড়ি, একটাও লোক নেই কেন আমার মাথায় আসছে না!"

"আমারও খুব ফিশি মনে হচ্ছে।"

দোতলার আয়োজন আরও বিশাল। চওড়া, টানা, চিক ফেলা বারান্দা। শেষ মাথায়, মোটা মোটা গরাদ বসানো খাঁচায় বিশাল দুটো ম্যাকাও পাখি খ্যা, খ্যা করে ডাকছে, আর মাঝে মাঝে লোহার গরাদে টিনকাটা কাঁচির মতো ঠোঁট ঠুকছে। ঘরের ভেতর ঘর, তার ভেতর ঘর। এমনি বেশ সাজানো-গোছানো, তবে দীর্ঘকাল ঝাড়ামোছা হয়নি। পাতলা ধুলোর স্তর জমে আছে মেঝেতে, ফার্নিচারে।

একেবারে শেষের ঘরে এসে আমাদের অনুসন্ধান শেষ হল। নীল কাঁচ ঘেরা, নীল একটি ঘর। সমস্ত আসবাবপত্র সাদা। বড় অদ্ভুত দৃশ্য। ছোট্ট একটি সাদা টেবিলের ওপর সাদা প্রিয়দর্শিনী ফোন। সাদা বেতের চেয়ারে অসাধারণ সুন্দর একজন মানুষ যেন ঘুমিয়ে পড়েছেন। রিসিভার-ধরা ডান হাতটি টেবিলের ওপর এলিয়ে পড়ে আছে। মাথাটা সামনে ঝুলে আছে। বসে বসে ঘুমিয়ে পড়লে যেমন হয় আর কি!

অভয়বাবু বললেন, "বাঃ, এ মূর্তিটার কী সুন্দর ভঙ্গি দেখুন। এটাও মনে হয় কোনও ইতালীয় শিল্পীর তৈরি!"

দাদু বললেন, "তোমার মুণ্ডু। এটা মূর্তি নয়, মানুষ! অ্যাণ্ড হি ইজ ডেড। মনে হয় এঁরই নাম বিপুলবরণ।"

"বিপুলকিরণ দাদু।"

"আরে বাবা, বরণ আর কিরণ এক জিনিস। ব্যাপারটা কী হয়েছে বুঝলে! টেলিফোনটি তুলে হ্যালো বলার আগেই স্ট্রোক।"

অভয়বাবু বললেন, "পোস্ট-মর্টেম না হলে মৃত্যুর কারণ বলা যাবে না।"

"তুমি বলছ মার্ডার?"

"হতে পারে। আচ্ছা, মেঝেতে এত চুন-বালি পড়ে আছে কেন! মনে হচ্ছে সিলিং থেকে খুলে পড়েছে। বাড়িটা পুরনো ঠিকই; কিন্তু ভেঙে পড়ার অবস্থা তো হয়নি।"

দাদু সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে ছোট্ট একটি ছিদ্র আবিষ্কার করলেন। রক্তমুখী নীলার মতো বাইরের আলো সেই ছিদ্রপথে নেমে আসছে। শুধু ওই ছেঁদা নয়, খানিকটা অংশ কেউ যেন ধারালো কিছু অস্ত্র দিয়ে কেটে দিয়েছে।

অভয়বাবু ব্যাটন তুলে উত্তেজিত হয়ে যেই দেখাতে গেলেন, "ওই দেখুন⋯", কথা শেষ হল না। টানটান তার হঠাৎ ছিঁড়ে পড়ে গেলে যে-রকম শব্দ হয়, চিন করে সেইরকম একটা শব্দের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাটনের মাথাটা কেটে দু' টুকরো হয়ে ঘুরতে ঘুরতে দূরে গিয়ে পড়ল।

"আরে ব্বাস, এ কী ব্যাপার?" অভয়বাবু ভয়ে মাথা নিচু করে মেঝেতে বসে পড়লেন।

দাদু বললেন, "কী আশ্চর্য! ভৌতিক ব্যাপার।"

"পুলিশ হয়ে ভূতে বিশ্বাস করি কেমন করে। দাঁড়ান, আর একবার পরীক্ষা করি। যে জায়গায় দাঁড়িয়ে যেভাবে ব্যাটনটা দুলিয়েছিলুম সেইভাবে আর একবার আর একটা কিছু দোলাই ওই ল্যাম্প-স্ট্যাণ্ডটা।"

অভয়বাবু ল্যাম্প-স্ট্যাণ্ডটা ধীরে ধীরে ওপরদিকে তুলতে লাগলেন। উত্তেজনায় আমাদের নিশ্বাস পড়ছে না। হঠাৎ একটা

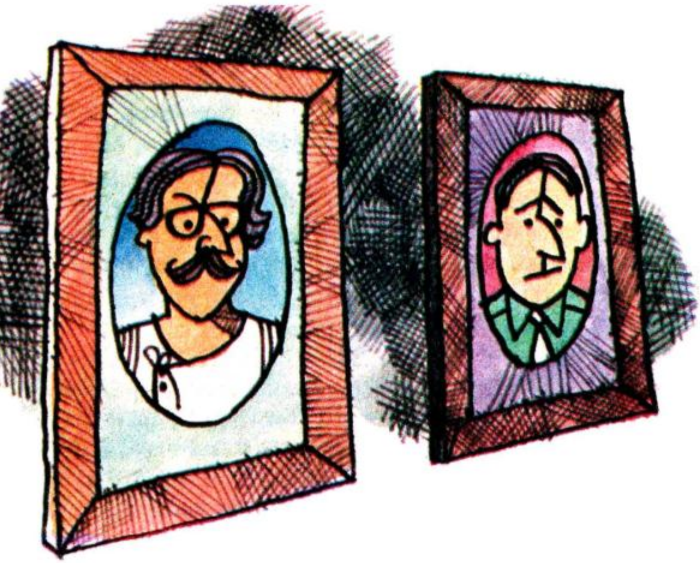

জায়গা বরাবর স্ট্যান্ডের মাথাটা আসতেই চিন করে সেইরকম একটা শব্দের সঙ্গে সঙ্গে মাথাটা কেটে উড়ে গেল। কেউ যেন ধারালো অস্ত্রে কোপ মেরে দিলে।

অভয়বাবু মেঝেতে বসে পড়ে বললেন, "কী বুঝছেন ? ওই জোনে মানুষের মাথা পড়লে উড়ে যাবে।"

দাদু গোল হয়ে চারপাশটা ভাল করে একবার দেখে নিলেন। চোখদুটো উত্তেজনায় জ্বলজ্বল করছে। "বুঝলে অভয় এ ঘরে খুব বেশি নড়াচড়া না করাই ভাল। যে যেখানে আছি, সেইখানে দাঁড়িয়েই ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করা যাক।"

"দাদু, আমি একটা কথা বলব ?"

"এই দুর্দিনে তুমি আবার অশান্তি করবে ?"

"অশান্তি নয়। আমি একটা জিনিস লক্ষ করছি, রিসিভারের যে মুখটা কানে দেওয়া হয়, সেই মুখটা টেবিলের ওপর এখন যেভাবে যেমন পড়ে আছে, সেই বৃত্তের কেন্দ্রবিন্দু থেকে কোনাকুনি একটা জ্যা টানলে, সেই জ্যা ছাদের যে অংশ স্পর্শ করে, সেই অংশটি ফুটো হয়ে-খুলে পড়েছে। চোখে দেখে আমার যা মনে হল, আপনাকে বললুম।"

দাদু আর অভয়বাবু দুজনেই একসঙ্গে বললেন, "বাবা, কী সাংঘাতিক জ্যামিতি ! তার মানে ? তুমি কী বোঝাতে চাইছ ?"

"আজ্ঞে, ওই যে কাল্পনিক রেখাটির কথা আপনাদের বললাম, ওই রেখার লাইনে কোনও কিছু এলেই দু-টুকরো হয়ে যাচ্ছে। যেমন ল্যাম্পস্ট্যাণ্ডের মাথাটা। বিশ্বাস না হয় আবার পরীক্ষা করে দেখুন।"

দাদু বললেন, "বলো কী ! তোমার মাথা তো বেশ খুলে গেছে !"

অভয়বাবু বললেন, "বেশ, আর একবার পরীক্ষা করা যাক।"

ল্যাম্পস্ট্যাণ্ডের বাকি অংশটা

হিসেবমতো তুলতেই চিন করে আবার সেই শব্দ, খানিকটা অংশ ঠিকরে চলে গেল। আনন্দে আমি হাততালি দিয়ে উঠলুম। আমার ধারণাই ঠিক।

অভয়বাবু বললেন, "উঃ, তুমি ঠিক ধরেছ তো ! আচ্ছা, কেন এমন হচ্ছে বলতে পারো ?"

"আজ্ঞে যদ্দুর মনে হয়, বিজ্ঞানের গল্প পড়ে যা জেনেছি, ওই রিসিভারের কানের অংশটি মারাত্মক, ওর মধ্যে এমন কোনও কল আছে, যা সুপারসনিক শব্দতরঙ্গ ছাড়ছে, যে তরঙ্গের ক্ষমতা অসীম। স্পেনে, এক্সম্যান বলে এক খুনি, ওই শব্দতরঙ্গ দিয়ে অনেক খুন করেছিল। নাইট অব দি বেলথাবাব বইয়ে পড়েছি। বিশ্বাস না হয় রিসিভারের মুখে একটা কিছু চাপা দিয়ে দেখুন।"

অভয়বাবু নিচু হয়ে টেবিলের ওপাশে গিয়ে উঠলেন। হাতের কাছে কিছু না পেয়ে একটা মোটা বই পাশ থেকে সাবধানে ইয়ারপিসের ওপর ফেলতেই সুঁই-সাঁত করে একটা শব্দ হল, সঙ্গে সঙ্গে বই ফুটো। শুধু ফুটো নয়, দপ করে আগুন ধরে গেল।

দাদু বললেন, "এ ক্লিয়ার কেস অব মার্ডার। ব্যাপারটা কী বুঝতে পেরেছ অভয় ! রিসিভারটি তুলে কানের কাছে আনার সঙ্গে সঙ্গে ইয়ারড্রাম ছ্যাঁদা করে ব্রেনের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে চলে গেছে। মৃত্যুর কারণ— কনকাসনস অব দি ব্রেন।"

"সে তো বুঝলুম, কেসটা কিন্তু ভীষণ কমপ্লিকেটেড হয়ে গেল। দেখলেন তো সেই কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরল !"

"তুমি সবার আগে ওই বিপজ্জনক রিসিভারটিকে উলটে রাখো।"

"আজ্ঞে ও আমার কম্মো নয়। একসপার্ট আনাতে হবে।"

"তা হলে শব্দ যে অ্যাক্সিস ধরে যাচ্ছে সেইটা খেয়াল রেখে ঘরটা একটু অনুসন্ধান

একটুখানি ন্যাট'এর ছোঁয়ায় জামাকাপড়ের রূপ খুলে যায়

ন্যাট সত্যিই বাজারের অন্যতম সেরা ডিটারজেন্ট পাউডার। সোডা অ্যাশে ভরা সস্তা পাউডারের থেকে ন্যাট যে ঢের বেশী ভাল তা ব্যবহার করলেই বুঝতে পারবেন। জামাকাপড় সহজে চমৎকার পরিষ্কার হয়। ন্যাটের দানাগুলো হালকা ব'লে এর ১ কেজি প্যাকেট সস্তা পাউডারের দু প্যাকেটের চেয়েও বেশী। তাই পরিমাণে লাগেও কম, চলেও অনেক দিন। ফলে খরচ বাঁচে অনেক।

ন্যাট ৪০ গ্রাম, ২০০ গ্রাম, ৫০০ গ্রাম, ১ কেজি ও ২ কেজি প্যাকেটে পাওয়া যায়।

রঙও হাসে, কাপড়ও বাঁচে সাদা হয় আরও সাদা

A *Kusum* **Product**

CCS.1425

করলে কিছু ক্লু পাওয়া যেতে পারে। ভদ্রলোকের নিশ্চয়ই ডায়েরি লেখার অভ্যাস ছিল। অন্তত আমার তাই ধারণা।"

"আচ্ছা আমার কিন্তু একটা সন্দেহ হচ্ছে মুকুজ্যেমশাই, মৃত ভদ্রলোকই কি বিপুলকিরণ, কারণ চোখে কোনও চশমা নেই।"

"আরে, চশমা তো আমার পকেটে। চোখে থাকবে কী করে?"

"চশমা যাঁরা দীর্ঘদিন পরেন তাঁদের নাকের ওপর একটু দাগ থাকে। কই চশমাটা দেখি।"

দাদু চশমাটা পুলিশ অফিসারের হাতে দিলেন। চশমাটা ভাল করে দেখলেন। চোখের সামনে তুলে ধরে, একবার কাছে এনে, দূরে সরিয়ে বললেন, "মাইনাস পাওয়ার এবং বেশ ভালই পাওয়ার। যাঁর চশমা, তিনি মায়োপিক। চশমা ছাড়া পৃথিবী তাঁর কাছে ধূসর। চশমা ছাড়া এক মুহূর্তও চলার কথা নয়। তাছাড়া ওই মুখের এই চশমা হতেই পারে না। কত বড় দেখেছেন?"

দাদু বললেন, "ইনি তা হলে কে?"

অভয়বাবু বললেন, "দেয়ালে দুটো ছবি ঝুলছে দেখেছেন? তার মধ্যে একজনের চোখে চশমা এবং এই চশমা। তার মানে, উনিই হলেন সেই নিরুদ্দিষ্ট বিপুলকিরণ। ছবিটার দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখুন।"

দাদু বললেন, "তুমি ঠিকই বলেছ। ইনি তাহলে কে?"

"দাঁড়ান, ওই ধোবিটাকে ডাকা যাক।"

কিছুক্ষণের মধ্যেই ধোবি এসে গেল। রুটি পাকাচ্ছিল। হাতময় আটা লেগে আছে। ঘরে ঢুকে লোকটি আড়ষ্ট হয়ে গেল। অভয়বাবু বললেন, "এই বাবুকে চেনো, উঁহু কাছে যেও না, মরবে। দূর থেকে দেখে বলো।"

লোকটি বললে, "এ বাবু, বিপুলবাবুর লেড়কা। কভি-কভি আসেন, কভি-কভি বাহার চলে যান। আওর কুছ হামি জানে না বাবু। সাচ বাত।"

"আচ্ছা, তুমি যাও।"

ধোবি সেলাম করে চলে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে আমি আর একটা জিনিস আবিষ্কার করলুম, মুখবন্ধ একটা চিঠি। চিঠিটা পোস্ট করা হয়নি। ঠিকানা লেখা হয়েছে, ডাকটিকিটও সাঁটা হয়েছে। যাঁকে উদ্দেশ করে লেখা তাঁর নাম মিসেস রোজমেরি চৌধুরি, জসলোক হসপিট্যাল।

দাদু বললেন, "অভয়, চিঠিটা খোলা যাক।"

চিঠিটা খোলা হল। বাংলাতেই লেখা, "মা, তোমার কথামতো বাবার তদারকি করতে এসে আমার খুব খারাপ লাগছে, বেশ ভয়ও করছে। বাবার এখন খুব খারাপ সময় যাচ্ছে। অর্থাভাব, শরীরও ভাল যাচ্ছে না। চারপাশে পাওনাদার। তার ওপর ম্যালকম নামক এক সায়েবের পাল্লায় পড়েছেন। দুজনে কিসের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন কে জানে! আমার মনে হয় ওই সায়েবই বাবাকে শেষ করে দেবেন। আমার আশঙ্কা যে কতদূর সত্য কালই তার প্রমাণ পেলাম। মাঝরাতে বাবা আর ম্যালকম সায়েব নীচের লাইব্রেরি ঘরে, যেখানে আমার ঠাকুর্দার পিতার স্ট্যাচু আছে সেই ঘরে ঢুকলেন। আমার ঘরে বিছানায় শুয়ে শুয়েই আমি টের পেলাম। ওঁদের দুজনকে অনুসরণ করার ইচ্ছা আমার আর হল না। সায়েব আমাকে তেমন পছন্দ করেন না। বাবাকেও আজকাল কেমন যেন অপরিচিত মানুষের মতো মনে হয়। আমি ভাবলাম লাইব্রেরি ঘরে ওঁরা হয়তো গভীর রাতে পড়াশোনা করবেন। ওঁরা একটা কিছু খুঁজছেন, সেটুকু আমি বুঝেছি। সারাদিন বইপত্তর ঘাঁটছেন, পরিবারের পুরনো রেকর্ড নাড়াচাড়া করছেন। একদিন ওঁদের একটা কথা ওভারহিয়ার করেছিলুম, 'সেভেনথ স্টেপ, আণ্ডার গ্রাউণ্ড।' কী তার মানে...

বুঝিনি, বোঝার চেষ্টাও করিনি। এখন মনে হচ্ছে উদাস হয়ে ভুলই করেছি। আজ এই দুপুর পর্যন্ত দুজনেরই পাত্তা নেই, অথচ গ্যারেজে গাড়িটা রয়েছে। এখন আমার কী করা উচিত ! পুলিশে যেতে সাহস হচ্ছে না একটি মাত্র কারণে, সে কারণ তুমি জানো। আমার মনে হয় তোমার একবার আসা উচিত। ইতি, সহস্রকিরণ।"

দাদু উত্তেজিত হয়ে বললেন, "অভয় লাইব্রেরি, সব রহস্য ওই ঘরে। দুজনে ঢুকেছে কিন্তু বেরোয়নি।"

"কী থাকতে পারে ও-ঘরে ?"

"এমন কিছু, যা দুজনে হন্যে হয়ে খুঁজছে। এই ম্যালকম লোকটাই বা কে ?"

আবার আমরা লাইব্রেরি ঘরে এসে ঢুকলুম। বাতাসে একটা পোড়া-পোড়া গন্ধ। কাগজ পোড়া ! চুরুট ! কিসের গন্ধ ! এ গন্ধ তো একটু আগে ছিল না।

দাদু বললেন, "অভয়, একটা গন্ধ পাচ্ছ ?"

"পাচ্ছি মুকুজ্যেমশাই। আগে ছিল না।"

"আচ্ছা, সেভেনথ স্টেপ, আণ্ডার গ্রাউণ্ড মানেটা কী ?"

"মাটির তলায় সপ্তম ধাপ।"

"কোন মাটি ? এই ঘরের মাটি ? আচ্ছা এই স্ট্যাচুটা কি আমরা ভাল করে দেখেছি ? বুড়ো, মাটিতে শুয়ে পড়ে কান পাতো।"

শুয়ে পড়ে কান পাততেই বহু দূর থেকে ভেসে আসা বাতাসের শোঁ-শোঁ শব্দ শুনতে পেলুম। সেই রকমই মনে হল যেন ! দাদুকে বললুম। সকলেই একবার করে শুনলেন। অভয়বাবু বললেন, "বাসুকির নিশ্বাস।"

দাদু বললেন, "ইঞ্চি-ইঞ্চি করে মেঝেটা পরীক্ষা করা দরকার। এই ঘর। এই ঘরেই ওরা এমন কিছুর সন্ধান পেয়েছে, যা মূল্যবান।"

আবার আমার আবিষ্কার। চেয়ারে বসে থাকা পাথরের মূর্তির তলায় একপাশে তেলের মত কী যেন পড়ে আছে। সহজে চোখে পড়ার কথা নয়। খুব খুঁটিয়ে দেখতে গিয়ে ধরা পড়ল। দাদু আর অভয়বাবু দুজনেই পরীক্ষা করলেন, "ঠিক বলেছ তুমি, তেলই। তেল কেন এল ?"

অভয়বাবু চেয়ারের হাতল ধরে বাঁ দিকে টানতেই মূর্তিটা একটু যেন ঘুরে গেল।

"মুকুজ্যেমশাই, এটা যেন ঘুরতে চাইছে।"

"তাই নাকি ? এসো তাহলে, মারো টান, ঘোরাও, ঘোরাও।"

দুজনের টানে পুরো একশো আশি ডিগ্রি সহজেই ঘুরে গেল। মূর্তির মুখ হয়ে গেল দরজার দিকে। গোল একটা গর্ত। অল্প-অল্প ধোঁয়া বেরোচ্ছে। সামান্য পোড়া পোড়া গন্ধ। ক্ষীণ একটা গোঙানির শব্দ। পাতালের অন্ধকার থেকে কে যেন অস্পষ্ট স্বরে বলছেন, "একটু জল, একটু জল।"

দাদু বললেন, "কুইক অভয়, কুইক। আলো ফেলো, আলো।"

টর্চের আলো পড়তেই দেখা গেল, ধাপে ধাপে সিঁড়ি নেমে গেছে পাতালের দিকে। অভয়বাবু আপনমনে বললেন, "সেভেনথ স্টেপ আণ্ডারগ্রাউণ্ড।"

দাদু বললেন, "মনে রেখো, সেভেনথ স্টেপ মানে সপ্তম ধাপ।"

"আমরা তাহলে নামতে থাকি মুকুজ্যেমশাই ?"

"অবশ্য, অবশ্য। প্রতিটি মুহূর্ত এখন মূল্যবান।"

এক ধাপ, দু ধাপ, ধাপগুলো বেশ উঁচু-উঁচু। পোড়া-পোড়া গন্ধটা বেশ প্রবল হচ্ছে ক্রমশ। পঞ্চম ধাপ। আমরা বেশ নীচে নেমে এসেছি। গরম একটা বাতাস আসছে। ষষ্ঠ ধাপে অভয়বাবু থেমে পড়লেন। পেছনে দাদু, তার পেছনে আমি। দাদু জিজ্ঞেস করলেন, "কী হল অভয় ?"

"সপ্তম ধাপটা নেই মুকুজ্যেমশাই। ভেঙে ফেলেছে। এখন আমাদের জয় মা বলে লাফাতে হবে। পারবেন আপনি ?"

"খুব পারব। মারো লাফ। খুব সাবধান। কিসের ওপর লাফাচ্ছ একবার দেখে নাও। তলিয়ে যেও না যেন।"

অভয়বাবু একটা পুলিশি লাফ মারলেন। অন্ধকারে কোথায় গিয়ে পড়লেন বোঝা গেল না। টর্চের আলো দুলে উঠল। পর-পর আমরা দুজনে লাফিয়ে পড়লুম। অদ্ভুত সুন্দর এক সুড়ঙ্গ। সামনে চলে গেছে। কোথায় গেছে কে জানে ! সোজা হয়ে দাঁড়ানোও চলে। ছাদটা যদিও মাথার খুব কাছে। দূরে একটা আগুন ফুলকি কেটে কেটে সামনে আমাদের দিকেই যেন এগিয়ে আসছে।

দশ-বারো পা এগোতেই গোঙানির শব্দটা আরও স্পষ্ট হল। একজন মানুষ কাত হয়ে পড়ে আছেন। মুখ বাঁধা। হাত-পা পিছমোড়া। দাদু বললেন, "আরে ! এই তো বিপুলকিরণ।"

অভয়বাবু হঠাৎ আতঙ্কের গলায় বললেন, "সর্বনাশ, এ কী করেছে। কুইক, কুইক। আগুনটা কোথায় কী ভাবে এগিয়ে আসছে দেখেছেন। এখুনি ঝাড়বংশ শেষ হয়ে যাব।"

মুখখোলা একটা পেট্রলের টিন, তার ভেতর থেকে বেরিয়ে গেছে দড়ির পলতে। আর মাত্র হাত-পাঁচেক দূরে আগুন। দড়ি বেয়ে সাপের মতো খেলতে-খেলতে এগিয়ে আসছে। অভয়বাবু ছোঁ মেরে দড়িটা টিন থেকে তুলে নিয়ে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। ছুটে গিয়ে পা দিয়ে চেপে চেপে আগুনটা নিবিয়ে দিলেন।

দাদু বললেন, "মারার কল বেশ ভালই তৈরি করে রেখে গেছে। কার কাজ বলো তো ?"

অভয়বাবু বিপুলকিরণের মুখের বাঁধন

খুলতে খুলতে বললেন, "ইনিই বলতে পারবেন।"

বিপুলবাবু বললেন, "একটু জল।"

দাদু বললেন, "জল পরে, আগে বলুন ব্যাপারটা কী?"

"ম্যালকম, ম্যালকম আমার সর্বনাশ করে চলে গেছে।"

"কোথায় গেছে।"

"ওই সপ্তম ধাপের তলায় ছিল বহুমূল্য সোনার জগদ্ধাত্রী। কেউ জানত না। আমরা দুজনে সারা রাত ধরে খুঁড়ে বের করার পর আচমকা আমাকে আক্রমণ করে। আমার এই অবস্থা করে, সুড়ঙ্গ ধরে সোজা চলে গেছে সামনের দিকে।"

"কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে এই সুড়ঙ্গ?"

"একেবারে ফোর্টের ধারে গঙ্গায় গিয়ে পড়েছে।"

"বাবা সে তো দীর্ঘপথ! কতক্ষণ আগে গেছে?"

"খেয়াল নেই। এখন দিন কি রাত আমার জানা নেই।"

"আপনি আমাদের সঙ্গে যেতে পারবেন?"

"একটু জল।"

আমার পকেটে কিছু লজেন্স ছিল। দুটো বের করে বিপুলবাবুর হাতে দিলুম মোড়ক খুলে। অভয়বাবু বললেন, "চুষতে চুষতে চলুন। আর ভাববার সময় নেই।"

আমরা চারজনে প্রায় দৌড়তে শুরু করলুম। কী মজা! মাথার ওপর কলকাতা, আমরা তলা দিয়ে ছুটছি। উলটো দিক থেকে ড্যাম্প বাতাস আসছে। সোঁদা-সোঁদা গন্ধ। মাঝে মাঝে হিস-হিস শব্দ আসছে। মনে হয় সাপ। জায়গায় জায়গায় মাথার ওপর গাছের শিকড় ঝুলে পড়েছে হিলহিলে সাপের মতো।

বিপুলবাবু হাঁপাতে-হাঁপাতে বললেন, "আর আমরা ওকে ধরতে পারব না। বড় সাংঘাতিক ক্যারেকটার। বন্ধুর ছদ্মবেশে এসেছিল ইন্টারন্যাশনাল স্মাগলার।"

দাদু ছুটতে ছুটতে বললেন, "তবু চেষ্টা। ও হ্যাঁ, এই নিন, আপনার চশমা আর নোটবুক। এই দুটোর জোরেই প্রাণে বাঁচলেন।"

এইবার মনে হচ্ছে কোথাও একটু বসতে পারলে হত। আলিপুর থেকে ফোর্ট, কম দূর! অভয়বাবুর হাতের টর্চ সামনের দিকে অন্ধকারের বুক চিরে চলে গেছে। এতক্ষণ আলোকে অন্ধকার গ্রাস করে নিচ্ছিল। হঠাৎ আলো কিসে যেন ঠিকরে ফিরে এল। অন্ধকার ঝলমল, ঝলমল করে উঠল। চোখ ধাঁধিয়ে গেল।

দাদু উত্তেজিত হয়ে বললেন, "জ্যোতি, জ্যোতি।"

বিপুলবাবু প্রায় চিৎকার করে বললেন, "আমার সোনার জগদ্ধাত্রী, সোনার জগদ্ধাত্রী।"

দেয়ালে পিঠ দিয়ে লম্বা চেহারার এক সায়েব চোখে হাত চাপা দিয়ে বসে আছেন। দেখলেই মনে হয় সম্পূর্ণ অসহায়। বিপুলবাবু দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, "স্কাউন্ড্রেল ম্যালকম।"

ম্যালকমের হাতদুটো চোখের সামনে তোলাই ছিল, অভয়বাবু কড়াক কড়াক করে হাতকড়া পরিয়ে দিলেন। ম্যালকম ক্ষীণ স্বরে বললে, "কে, পুলিশ?"

অভয়বাবু ব্যঙ্গের সুরে বললেন, "কেন দেখতে পাচ্ছ না মানিক!"

ম্যালকম করুণ সুরে বললে, "দেখতে পেলে, আমাকে কি আর এখানে দেখতে পেতে! ওই মূর্তি আমাকে অন্ধ করে দিয়েছে। শুধু অন্ধ নয়, আমার পা দুটোও অসাড় হয়ে গেছে। বিলিভ ইট অর নট।"

"আমরা এখন তাহলে কোন্ দিকে যাব মুকুজ্যেমশাই। শুরুর দিকে, না শেষের দিকে?" অভয়বাবু প্রশ্ন করলেন।

দাদু বললেন, "শুরুর দিকে। যেদিক

থেকে এসেছি, সেই দিকেই যেতে হবে। বিপুলবাবু হয়তো দুঃখ পাবেন, তবু সত্যকে তো আর চেপে রাখা যাবে না। আপনার ছেলে সহস্রকিরণ খুন হয়েছে।"

আমি ভেবেছিলুম খবরটা শুনেই বিপুলবাবু উলটে পড়ে যাবেন। না, খুব সামলে নিলেন। সামান্য একটু মুখের শব্দ করে বললেন, "আমাদের কিন্তু শেষ থেকেই শুরু করতে হবে।"

"তার মানে ?"

"আমরা মূর্তিটা নিয়ে ফোর্টের দিকে যাব। ওখানে আমার গাড়িটা এই ব্যাটা সায়েব পার্ক করে রেখে এসেছে। গাড়িটাকে নিয়ে আসা দরকার। গাড়িটার এখন অনেক দাম। ওল্ড মডেল।"

"তা মূর্তিটা নিয়ে যাবার কী দরকার ? ওটা এখানেই থাক না।" অভয়বাবু খুঁতখুঁতে গলায় বললেন।

বিপুলবাবু বললেন, "এই অভিশপ্ত সুড়ঙ্গে আর ঢুকতে চাই না। তাছাড়া, আমরা এখন ফোর্টের খুব কাছে আছি। দেখছেন না, গঙ্গার বাতাস আসছে। আমরা গাড়ি চেপে ফিরে আসব।"

অভয়বাবু বললেন, "ফিরে আসব কেন ? সোজা থানায় চলে যাব। মূর্তিটাকে সরকারি খাতায় জমা করে দিতে হবে।"

বিপুলবাবু বললেন, "সে আবার কী কথা ! আমার মূর্তি সরকারি খাতায় চলে যাবে ? এ যে দেখছি হবু রাজার আইন।"

"বিপুলবাবু, এটা এখন আর মূর্তি নয়। সলিড গোল্ড। সরকারি আইনকানুন বড় জটিল। তাছাড়া আপনিই যে বিপুলকিরণ তার কোনও প্রমাণ নেই।"

দাদু বললেন, "অভয়, পয়েন্টটা তুমি ভালই তুলেছ হে। ধোবি যে চেহারার বর্ণনা দিয়েছে তার সঙ্গে তো মিলছে না। বিপুলবাবু, আপনার র‍্যাশান কার্ড আছে ?"

"র‍্যাশানের চাল, র‍্যাশান কার্ড এসব আমার স্ট্যাটাসের অনেক নীচে। আমার কাছে খুব ইনসাল্টিং মনে হয়।"

"তা বললে চলে ? র‍্যাশান কার্ড ছাড়া প্রমাণ করবেন কী করে, আপনি কলকাতার নাগরিক। তাছাড়া প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণের সঙ্গে আপনার চেহারা একদম মিলছে না।"

"প্রত্যক্ষদর্শী আবার কে ?"

"আপনারই ভাড়াটে ধোবি।"

"কী বর্ণনা দিয়েছে ?"

"বড়-বড় চুল, দাড়ি-গোঁফ, যেন তুলসীদাসজি। কখনও প্যান্ট-কোট পরেন, কখনও শেরোয়ানি।"

"ঠিকই বলেছে। কালই আমি দাড়ি-গোঁফ কামিয়ে ফেলেছি, এই এক্সপিডিশনের জন্যে।"

অভয়বাবু বললেন, "তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে তর্কাতর্কি করে লাভ কী ? মূর্তি আপনার না সরকারের, আইন ঠিক করে দেবে। আমরা পুলিশ, আইনের কী বুঝি বলুন ? আর আপনি যদি বিপুলকিরণ সত্যিই হন, এক মিনিটে প্রমাণ করে দিতে পারবেন। গাড়ির লাইসেন্স আছে। ব্যাঙ্কের পাশবই আছে। নিন চলুন। এগিয়ে চলুন।"

বিপুলবাবু পকেট থেকে একটা বড় তোয়ালে বের করে মূর্তিটায় জড়িয়ে দিলেন। তারপর বেশ কসরত করে তুলে নিলেন কোলে। মুখ দেখে মনে হচ্ছে বেশ ভারী। এতক্ষণ কেউ ভেবে দেখেনি, ম্যালকমসায়েব কী করে হাঁটবে। চোখ অন্ধ। পায়ে পক্ষাঘাত।

শলাপরামর্শ করে ঠিক হল, হাতকড়া বাঁধা অবস্থায় ম্যালকম যেমন আছে ওই ভাবেই থাকবে। একটা স্ট্রেচার এনে থানায় নিয়ে যাওয়া হবে চ্যাংদোলা করে।

অভয়বাবু বললেন, "ফরোয়ার্ড মার্চ।"

শব্দটার মধ্যে কী আছে, কে জানে ! সকলেই আমরা এগোতে লাগলুম সৈনিকের মতো। পাঁচ মিনিটও হাঁটা হয়নি, সুড়ঙ্গ শেষ হয়ে গেল। সামনেই দশ ধাপ সিঁড়ি। মাথার ওপর গোলাকার আকাশ। ভীষণ

কিশোররাই
যেসব রোমাঞ্চকর উপন্যাসের রহস্যসন্ধানী

শেখর বসু
সোনার বিস্কুট ৮.০০
আনন্দ বাগচী
বনের খাঁচায় ৮.০০
নলিনী দাশ
মধ্যরাতের ঘোড়সওয়ার ৬.০০

শেখর বসু 'সোনার বিস্কুট', আনন্দ বাগচীর 'বনের খাঁচায়' অথবা নলিনী দাশের 'মধ্যরাতের ঘোড়সওয়ার' প্রত্যেকটিই দুর্দান্ত রোমাঞ্চজাগানো উপন্যাস। তিব্বতী জাদু শিখতে গিয়ে তিন স্কুলের বন্ধু কীভাবে জড়িয়ে পড়ল ভয়ংকর রহস্যের জালে, তাই নিয়ে 'সোনার বিস্কুট'। 'বনের খাঁচার' পটভূমিকা চিড়িয়াখানা। নায়করূপে এক জাতিস্মর কিশোর। একটি দুঃসাহসিক ডাকাতির রহস্যের গোয়েন্দাগিরি কীভাবে করল পুপে আর তার মামাতো বোন, তাই নিয়ে 'বনের খাঁচায়'। 'মধ্যরাতের ঘোড়সওয়ার'ও কয়েকজন স্কুলের ছেলের রহস্য সন্ধানের এক সজীব কাহিনী। তান্ত্রিকের অভিশাপ, পুরনো খুন আর রহস্যময় ঘোড়ার খুরের নতুন আওয়াজ এই সবকিছুর জট কীভাবে খুলল, তাই নিয়েই 'মধ্যরাতের ঘোড়সওয়ার'। তিনটি উপন্যাসেই রহস্যসন্ধানীরা সবাই কিশোর, এবং স্কুলের ছাত্র। অথচ অভিজ্ঞতা এবং জট-খোলায় তাদের জুড়ি নেই।

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯, ফোন : ৩৪৪৩৬২

অবাক লাগছে। অত বড় একটা গোলমুখ, বাইরের কারুর নজর পড়ে না কেন? অনবরতই তো লোক চলাচল করছে। কেউ কি একবার ভাবেও না গর্তটা কিসের! আচমকা কেউ পড়ে যেতেও তো পারে?

সব প্রশ্নের জবাব পেলুম ওপরে এসে। গর্তের মুখটা মনে হয় কালও চাপা ছিল। গোল একটা ঘাসের চাবড়া উলটে পড়ে আছে একপাশে। লোহার ঢাকনার ওপর কার্পেটের মতো ঘাস গজিয়েছে। অষ্টাদশ শতকের সুড়ঙ্গমুখ বিংশ শতকে খোলা হল। আমরা প্রিন্স অব ওয়েলসের মেমোরিয়ালের কাছে উঠে এসেছি। সামনেই দ্বিতীয় হুগলি সেতুর বিশাল বিশাল পিলার। জায়গাটা বেশ নির্জন নির্জন। লোক চলাচল নেই বললেই চলে। দূরে দূরে গাড়ি ছুটছে। ফাঁকায় এসে দম ছেড়ে বাঁচলুম। একপাশে সেই বিদ্‌ঘুটে গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে। ধোবির বর্ণনার সঙ্গে বেশ মিলে যাচ্ছে। গাড়িটার পেছন দিকে অনেক পাইপ বেরিয়ে আছে। পুরনো গাড়িতে এত পাইপ থাকত নাকি?

ফিস-ফিস করে দাদুকে প্রশ্ন করলুম। দাদু একটু বিরক্ত হলেন, "তুমি আর জ্বালিও না বাপু।"

"ঠিক আছে, জ্বালাব না। তবে গাড়ির চেহারাটা বড় সন্দেহজনক।"

বিপুলবাবু মূর্তিটাকে ড্রাইভারের পাশের আসনে সাবধানে বসালেন। তোয়ালের মোড়কে ফুট-দুয়েক উচ্চতার একটি আকৃতি।

অভয়বাবু বললেন, "আমরা তাহলে পেছনে উঠে বসি।"

বিপুলবাবু বললেন, "দাঁড়ান, আগে দেখি স্টার্ট নেয় কি-না। তা না হলে হাতল মারতে হবে। মাঝে মাঝে ঠেলতেও হয়।"

বিপুলবাবু দরজা খুলে চালকের আসনে বসলেন। দরজা বন্ধ করে পায়ের কাছে কোনও একটা কিছুতে চাপ দিলেন। ইঞ্জিন গর্জন করে উঠল। আওয়াজটা কানে লাগল। নতুন ধরনের আওয়াজ। পেছনের পাইপ দিয়ে নীল এক ঝলক আগুন বেরিয়ে এল। একটা, দুটো, তিনটে, চারটে। সব কটা পাইপের মুখে আগুন জ্বলছে। এক একরকম রঙ। নীল, লাল, চাঁপাফুল।

অভয়বাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কী, সব ঠিক আছে তো?"

বিপুলবাবু বললেন, "হ্যাঁ, ঠিক আছে।"

"আমরা তাহলে উঠি।"

"হ্যাঁ উঠে পড়ুন।"

অভয়বাবু দরজার দিকে হাত বাড়ালেন। ঠিক পেছনেই দাদু, পাশে আমি। নিমেষে ব্যাপারটা ঘটে গেল। বিদ্যুৎবেগে গাড়িটা গঙ্গার দিকে ছুটে গেল। অভয়বাবু বাতাসের ঝাপটায় উলটে পড়ে গেলেন। মনে হল একটা রকেট উড়ে চলে গেল। পেছন দিকে আগুন গলে গলে পড়ছে। সমস্ত আওয়াজ ছাপিয়ে শোনা গেল অট্টহাসি। "গুডবাই। গুডবাই মিস্টার চিপস।"

আমি আর অভয়বাবু দুজনেই দৌড়াতে লাগলুম। ব্যর্থ চেষ্টা। গাড়ি ম্যান অব ওয়ার জেটির ওপর দিয়ে সোজা জলে নেমে তীব্র বেগে ডায়মণ্ডহারবারের দিকে ছুটে গেল।

অভয়বাবু হতাশ হয়ে বললেন, "এটা কী হল?"

"আজ্ঞে, গাড়িটা অ্যাম্ফিবিয়াস।"

"সে আবার কী?"

"উভচর। স্থলেও চলে, জলেও চলে। জেট ইঞ্জিন লাগানো।"

"ইডিয়েট।"

"কে আমি?"

"তুমি না, তুমি, আমি।"

"আমি পেছনে অতগুলো পাইপ দেখে দাদুকে বলেছিলুম। দাদু বললেন, আর জ্বালাসনি।"

"লোকটা কে বলো তো?"

"ওর নাম মনে হয়, ক্যালিপসো-গ্রম্বোফব।"

"সে আবার কে?"

"আজ্ঞে, বইয়ে পড়েছি, পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ অপরাধী।"

"দূর, সে হল গল্প।"

"গল্পই তো সত্যি হল?"

"তা ঠিক।"

দাদু এসে গেছেন, "কী, ভেগেছে তো?"

"হ্যাঁ, কলা দেখিয়েছে। আচ্ছা, চশমাটা ঠিক আপনি কোন্ জায়গায় পেয়েছিলেন?"

"চলো দেখাচ্ছি।"

যেখান থেকে আমরা চশমা আর নোটবই পেয়েছিলুম সেই জায়গাটায় এলুম। কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে ফোর্টের পরিখা। দুজন মিলিটারি অফিসার গলফ স্টিক উঁচিয়ে, অনেকটা নীচে ঝোপের মধ্যে কিছু একটা দেখাচ্ছেন উত্তেজিত হয়ে। কিছু দূরে একটা শকুন বসে আছে।

অভয়বাবুকে দেখে একজন চিৎকার করে বললেন, "অফ্‌সার, হিয়ার লাইজ এ ডেডম্যান।"

অভয়বাবু তাঁর বিশুদ্ধ ইংরিজিতে উত্তর দিলেন, "হাউ টু গো দেয়ার, হিয়ার ইজ কাঁটাতারের বেড়া।"

দাদু বললেন, "ইশ, ইশ, ইংরিজি বাংলায় জগাখিচুড়ি করছ, বলো বার্বড ওয়্যার ফেনসিং।"

"মুকুজ্যেমশাই, আমার আর মাথার ঠিক নেই, মরতে মরতে বেঁচে গেছি।"

আর্মি অফিসাররা স্টিক নাচিয়ে বললেন, "কাম দ্যাট ওয়ে।"

"কামিং, কামিং উইথ মাই ফোর্স।"

দাদু বললেন, "এখন আমাদের সেই আলিপুর অব্দি হাঁটতে হবে নাকি?"

"হাঁটতে হবে কেন। এখনও পুলিশের

ঝলমলে ঝিলমিল

কলকাতা শহর। ইট, কাঠ, লোহা দিয়ে গড়া। মানুষের ভীড়। ট্র্যাফিক জ্যাম। এইসব।

এইসবের মধ্যে স্কুল করতে করতে প্রাণটা হাঁপিয়ে ওঠে ছোটদের। একটুখানি খোলা হাওয়া, সবুজ জমি, নীল আকাশের ভিক্ষে চায় চোখ দুটো। তাই শনি-রবিবার মা বাবার কাছে আব্দার আসে চিড়িয়াখানা, বোটানিক্যাল গার্ডেন, ভিক্টোরিয়া যাবার। ছুটির দিনগুলোতে বাবা মা'রাও চান ছেলে-মেয়েদের একটুখানি প্রকৃতির সঙ্গ দিতে।

দিগন্ত ছোঁওয়া সবুজ মাঠ, নীল আকাশের উদার আহ্বান-ওয়ালা এমনই একটা খাসা জায়গা হল সল্টলেকের ঝিলমিল। সবার আগে মন কেড়ে নেয় এখানকার টয়ট্রেন। তারপর রয়েছে সাপের ডেরা। পাখির খাঁচা। মিনি পাহাড়। আর হাঁটতে যদি চাও, যদি চাও দৌড়ে গিয়ে আকাশটাকেই ছুঁয়ে দিতে, তাহলে একছুটে এগিয়ে যাও বহুদূরে। অবশ্য আকাশটা তখন আরও দূরে ছুটে পালাবে ঠিক যেন লুকোচুরি খেলা। প্রকৃতির কোলে, এমন একটা বিস্তৃত খোলা এলাকা আর কোথায় পাবে? আর জলার ধারে নল খাগড়ার বন? সব মিলিয়ে ঝিলমিল যেন গ্রাম আর শহরের করমর্দন। কলকাতা মহানগরীতে এরকম আরও কয়েকটা ঝিলমিল নেই বলেই আফশোষ হচ্ছে।

(জনসংযোগ বিভাগ সি এম ডি এ ৩ এ, অকল্যাণ্ড প্লেস, কলিকাতা—৭০০০১৭ থেকে প্রচারিত)

সে খাতির আছে। হাত তুললে যে-কোনও গাড়ি থেমে যাবে।"

"তার আগে চলো আমরাই একবার ডেড-বডিটা দেখে আসি। ফোর্টের প্ল্যাসি-গেট দিয়ে ঢুকে পড়ি। আমার ভীষণ কৌতূহল হচ্ছে।"

"কৌতূহলের কী আছে ? ময়দানে অমন ডেডবডি হামেশাই পড়ে থাকে। আর একটা কেস বাড়ল।"

"আজ্ঞে না, এর সঙ্গে ওই চশমার যোগ আছে।"

ফোর্টের পথ ঢালু হয়ে ক্রমশ নীচের দিকে নেমে গেছে। দুজন অশ্বারোহী সৈনিক দুলকি চালে চলেছে। স্পটে পৌঁছতে প্রায় মিনিট-দশেক সময় লাগল। বাবা, কলকাতার তলায় এ যেন আর এক কলকাতা।

ঝোপঝাড়ের মধ্যে সাদা লংকোট-পরা একজন মানুষ যেন ঘুমে অচেতন। লম্বা-লম্বা চুল, দাড়ি। দাদু বললেন, "এই দ্যাখো, আসল বিপুলকিরণ এখানে পড়ে আছে চিরনিদ্রায়। ব্যাপারটা কী বলো তো, মার্ডার !"

"তাই তো মনে হচ্ছে। পুরোটাই ইনভেসটিগেশানের ব্যাপার । দেখলেন তো, তখনই বলেছিলুম, কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরোবে।"

"তাই তো জগতের নিয়ম রে বাবা। বিপুলকিরণকে ওই দুটো ঠগ কালই শেষ করেছে। অসাবধানে চশমাটা ফেলে রাখায় সব গোলমাল হয়ে গেল। পালের গোদাটা পালাল জেট গাড়িতে চেপে। ফাঁদে পড়ে গেল সায়েব।"

"আমি এখন কিছু মন্তব্য করব না। ফার্স্ট ইনভেসটিগেশান, দেন রিপোর্ট।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে তো বটেই। আইন ইজ আইন। তবে আমার অনুমানের কথা তোমাকে বললুম।"

অভয়বাবু অফিসারদের বললেন, "আপনাদের ওয়্যারলেসটা একটু ব্যবহার করতে চাই। উই হ্যাভ আনআরথ্‌ড এ টানেল, নিয়ার টু ইওর ফোর্ট। ডেডবডি হিয়ার, ডেডবডি দেয়ার, ডেডবডি এভরিহোয়্যার।"

দাদু বললেন, "আঃ অভয়, তোমার ইংরিজিটা তেমন সুবিধের নয়। কাজ করো, কাজ করো।"

আর্মি-অফিসাররা গল্‌ফ স্টিক নাচাতে নাচাতে এগিয়ে চললেন, আমরা পেছনে। বেতার-প্রেরক যন্ত্রের বিশাল টাওয়ার আকাশের দিকে উঠে গেছে। এক ধরনের সুঁই-সুঁই আওয়াজ হচ্ছে। ঘরে বসে আছেন কানে হেডফোন লাগিয়ে এক জওয়ান।

অভয়বাবু বললেন, "সমস্ত পোর্টকে অ্যালার্ট করে দিন, ক্লস্ট্রোফোবিয়া উভজানে চেপে ভাগছে। ক্যাচ হিম। ক্যাচ হিম।"

আমি বললুম, "ক্লস্ট্রোফোবিয়া নয়, ক্যালিপসো থ্রম্বোফব।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ ক্যালিপসো থ্রম্বোফব।"

জওয়ান ভদ্রলোক, তিনবার হ্যালো হ্যালো করে বলতে লাগলেন, "নট, নাইন, এইট, সেভেন, সিক্স...।"

দাদু আমার হাত ধরে বললেন, "চলো, সন্ধ্যাহ্নিকের সময় হল। বাকি কাজটা অভয় একাই করে নিতে পারবে।"

যেতে যেতে শুনলুম বাতাসে উড়ে যাচ্ছে সতর্ক-বাণী, "পোর্ট ক্যানিং, পোর্ট হার্বার, অ্যালার্ট, অ্যালার্ট, ক্যালিপসো থ্রম্বোফব।"

ট্যাক্সিতে বসে প্রশ্ন করলুম, "ক্যালিপসো থ্রম্বোফব কে দাদু ?"

উদাস গলায় দাদু বললেন, "কে জানে ! মাস্তানফাস্তান হবে।"

"আমি জানি, আমার মনে পড়েছে, ক্যালিপসো একটা রেকর্ডপ্লেয়ারের নাম থ্রম্বোফব একটা মলম।"

হিহি। কী মজা !

ছবি : দেবাশিস দেব

আয়না

রথীন্দ্র সেনগুপ্ত

অদ্ভুত আর বেজায় রকম মজাদার
আয়না রয়েছে ঘরের ভিতর ভজাদার।
ঘরে ঢুকতেই যেই না দিয়েছে বকুনি
ফিরে যেতে গিয়ে চোখে পড়ে গেল তখুনি।

প্রথমেই এক বিকট রকম লম্বা
ছায়া ফুটে ওঠে। ভাবি আমি কিসে কম বা
উড়ন্ত চিল ধরে ফেলি এই মুঠিতে
লাল নীল ফিতে বাঁধি মেঘেদের ঝুঁটিতে।

তারপরে যেই ছায়া ফুটে ওঠে তেকোনা
ভজাদা চ্যাঁচায়—'ওদিকে তাকিয়ে থেকো না,
এখুনি বেরোবে জঘন্য এক দত্যি
গপ্পো নয় রে, সত্যি, সত্যি, সত্যি।'

তারপর দেখি অস্বাভাবিক চ্যাপ্টা
একজোড়া ঠোঁট চোখ বুঁজে পাটিসাপ্টা
খাচ্ছে। অথচ আমার মুখ তো বন্ধ।
বাতাসেও যেন আশশ্যাওড়ার গন্ধ!

শেষমেশ এক ছায়া ফুটে ওঠে বাঁকানো,
সেইদিকে আর হয়নি আমার তাকানো।
বুঝেছি কেন যে ভজাদা এমন আয়না
ছোটদের কাছে কখনো দেখাতে চায় না।

ছবি অহিভূষণ মালিক

কিশোর-ক্লাসিক

সুইস ফ্যামিলি রবিনসন

যোহান রুডলফ উইস

ভাষান্তর : **শেখর বসু**

॥ ২ ॥

দেখেশুনে পছন্দসই একটা পাহাড়ের গায়ে গর্ত খুঁড়তে শুরু করে দিলাম আমরা। ফুট-সাতেক খোঁড়ার পরে গ্রেনেড চার্জ করতেই বিশাল একটা গুহা বেরিয়ে এল। বেশ কয়েকদিন ধরে প্রচণ্ড খেটেখুটে গুহাটাকে আমরা মনের মতো করে সাজালাম। জানলা-দরজা বসানো হল। পরের শীত-বর্ষা সেই গুহায় দিব্যি আরামে কেটে গেল আমাদের।

তারপরেই একটা মারাত্মক ঘটনা ঘটল। একদিন আমি আর আমার গিন্নি গুহার মুখে বসে গল্প-টল্প করছি, এমন সময় ফ্রিট্জ সমুদ্রতীর থেকে ছুটতে ছুটতে এসে বলল, ভয়ংকর একটা প্রাণী এদিকে আসছে। প্রাণীটা এগোবার সঙ্গে সঙ্গে বালির ঝড় উঠছে আকাশে।

কথাটাকে পাত্তা না দিয়ে ফ্রিট্জের মা বলল, শুয়োর কিংবা ভেড়াগুলো বোধহয় খেলা করছে, তাই বালি উড়ছে ওভাবে।

প্রতিবাদ করে উঠল ফ্রিট্জ : না, শুয়োর-ভেড়া নয়, বিশাল লম্বা পাইপের মতো একটা জন্তু।

কী ব্যাপার দেখার জন্যে উঠে পড়লাম আমি। তারপরেই ভয়ংকর এক দৃশ্য চোখে পড়ল। বিশাল আকারের একটা সাপ

এঁকেবেঁকে এদিকে আসছে। চটপট গুহায় ঢুকে পড়ে গুহার অধিকাংশ জানলা-দরজা বন্ধ করে দিলাম আমরা। একটা ফাঁক দিয়ে নজর রেখেছিলাম বাইরে। কিছুক্ষণ বাদে দেখি বিশাল সেই সাপটা গুহার দিকেই এগোচ্ছে। সর্বনাশ! আমি আর ফ্রিট্জ গুলি ছুঁড়লাম। বুঝতে পারলাম না গুলি সাপের গায়ে লেগেছে কি না। যা মোটা চামড়া সাপের, ওই চামড়া কি বন্দুকের গুলি ভেদ করতে পারবে! তবে আমাদের কপাল ভাল, সাপটা হঠাৎ দিক পরিবর্তন করে ওদিকের ওই জলার মধ্যে নেমে গেল।

কিন্তু এখন গুহা থেকে বেরুনো ঠিক হবে না, সাপটা হয়তো সুযোগের অপেক্ষায় ওই জলার মধ্যে লুকিয়ে আছে। তিনদিন আমরা গুহার মধ্যে বন্দী থাকলাম। এদিকে রসদ ফুরিয়ে এসেছে প্রায়, এবার আর না বেরিয়ে উপায় নেই।

ঠিক হল, ওই জলার উলটোদিকে গরু-গাধাগুলো চরাতে নিয়ে যাওয়া হবে। কিন্তু একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল। গুহার মুখ খুলতেই একটা গাধা ছুট্টে চলে গেল ওই জলায়। তারপরেই ভয়ংকর এক দৃশ্য। আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে সাপটা পেঁচিয়ে ধরল গাধাকে। তারপর আস্ত গাধাটাকে গিলে ফেলল আস্তে আস্তে।

অত বড় একটা গাধাকে গিলে ফেলার

'আকাশ ঘিরে মেঘ করেছে
সূর্য্যি গেল পাটে ।
খুকু গেল জল আনতে
পদ্ম দিঘির ঘাটে ॥
পদ্ম দিঘির কালো জলে
হরেক রকম ফুল ।
হাঁটুর উপর দুলছে খুকুর
গোছাভরা চুল ॥'
Oasis
DOUBLE ACTION HAIR FERTILIZER
ঘন কালো সুন্দর
চুলের জন্য
ওয়েসিস ®
ডাবল অ্যাকশন
হেয়ার ফার্টিলাইজার
প্রস্তুত কারক :
HRI
হার্বল রিসার্চ ইনস্টিটিউট
কলিকাতা-৭০০ ০০৫
সব বড় দোকানে পাওয়া যায় ।

পরে নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল সাপটা। এখন ও আর নড়াচড়া করতে পারবে না, এই সুযোগে আমি আর ফ্রিট্‌জ এগিয়ে গিয়ে খুব কাছে থেকে গুলি করে সাপের মাথাটা গুঁড়িয়ে দিলাম।

গ্রীষ্মকালে দ্বীপের নানাদিকে ঘুরে বেড়ালাম আমরা। ফ্রিট্‌জ একদিন একটা ঈগলের বাচ্চা ধরল। বাচ্চাটাকে ও শিকারি পাখি বানাবার ট্রেনিং দিতে শুরু করে দিল মহানন্দে। জ্যাক ধরল একটা উটপাখি। বিশাল চেহারার উটপাখিটা দেখে ওর মা তো ভয়েই অস্থির। পাখিটা সবাইকে খেয়ে ফেলবে না তো! কিন্তু না, উটপাখিটা দেখতে দেখতে পোষ মেনে গেল দিব্যি। জ্যাক পাখির পিঠে চেপে ঘোড়ার কায়দায় ছোটায় পাখিটাকে। ভাইদেরও চড়তে দেয় মাঝেমধ্যে।

ডাঙায় ছোটার ঘোড়া হল, এবার জলে ছোটার জন্যে একটা পান্‌সি দরকার। ফ্রিট্‌জের শখ হয়েছে বলে তিমিমাছের হাড়, কাঠ আর বাঁশ দিয়ে ওইরকম একটা নৌকো বানিয়ে ফেললাম আমরা। নৌকো পেয়ে ফ্রিট্‌জ তো খুব খুশি। সেই নৌকোয় চেপে দু-চার পাক ঘুরেই ও নদীর মুখের দিকে বাইতে শুরু করে দিল। নদীর মুখে ভয়ংকর স্রোত। সেই স্রোতে নৌকো পড়তেই চোখের নিমেষে নৌকো চলে গেল গভীর সমুদ্রে। ফ্রিট্‌জের এই পাগলামো দেখে ভয় পেয়ে গেলাম আমি। তারপর ওকে উদ্ধারের জন্যে জ্যাক আর আর্নেস্টকে সঙ্গে নিয়ে বড় নৌকো খুলে দিলাম।

সমুদ্রের গভীরে বেশ কিছুটা যাবার পরে গুলির শব্দ কানে এল। গুলির শব্দ শুনে নিশ্চিন্ত হলাম কিছুটা। যাক, ও তাহলে বিপদে পড়েনি। পালটা গুলি ছুঁড়ে জবাব দিলাম আমি। কিছুক্ষণ পরে দেখা হল ওর সঙ্গে। একটা পাথরের ওপর বসে আছে ফ্রিট্‌জ। আমি খুব ধমকালাম ওকে: এরকম কাণ্ডজ্ঞানহীনের মতো কাজ করার কোনো মানে হয়?

ফ্রিট্‌জ নির্বিবাদে সব দোষ চাপিয়ে দিল নদীর স্রোতের ওপর। নদীর স্রোতই ওকে নাকি গভীর সমুদ্রে ঠেলে দিয়েছে।

ফেরার পথে প্রচণ্ড এক ঝড়ের মধ্যে পড়লাম আমরা। ফ্রিট্‌জকে নিয়ে আবার দুশ্চিন্তার মধ্যে পড়লাম আমি। ওর ছোট্ট নৌকো কিছুতেই এই ঝড়কে সামাল দিতে পারবে না। নির্ঘাত ওর নৌকো ডুবে গেছে। একটু বাদে ঝড় থেমে গেল। তীরের কাছাকাছি আসতেই ফ্রিট্‌জকে দেখতে পেলাম আবার। ও ওর মা'র সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে। এত বড় একটা বিপদ কেটে যাওয়ার আনন্দে আমরা সবাই হৈ-হৈ করে উঠলাম একসঙ্গে।

সুখে-শান্তিতে বেশ কয়েকটা বছর আমাদের কেটে গেল এই দ্বীপে। ছেলেরা সবাই এখন বেশ লম্বা-চওড়া আর সুপুরুষ।

ফ্রিট্‌জ এইসময় হঠাৎ বিশাল এক সম্পদ আবিষ্কার করে বসল। দ্বীপের ওই প্রান্তের সমুদ্র থেকে শুক্তি তুলে দেখে শুক্তির ভেতরে ঝলমলে পাথর। বেশ কিছু ঝলমলে পাথর সংগ্রহ করে আমার কাছে নিয়ে আসতেই চমকে উঠলাম আমি। আরে! এ তো মুক্তো!

ফ্রিট্‌জ গোপনে আমাকে আরও একটা খবর দিল। ও যখন সমুদ্র থেকে শুক্তি তুলছিল তখন একগাদা পাখি উড়ছিল ওর মাথার ওপর। লাঠি ঘোরাতেই একটা পাখি মুখ থুবড়ে পড়ে ওর পায়ের কাছে। সেই পাখিটার পায়ে একটা কাগজের টুকরো বাঁধা ছিল। সেই কাগজে লেখা আছে: ধোঁয়া-ওঠা পাহাড় থেকে ডুবন্ত জাহাজের নাবিককে বাঁচাও।

আমি বললাম, এটা কবে কে লিখেছে কে জানে! বলা যায় না, হয়তো বেচারা মারাই পড়েছে অ্যাদ্দিনে। যাই হোক, খোঁজ

নিতে হবে।

কয়েকদিন বাদে শুক্তি-শিকারের বিশাল সরঞ্জাম নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম আমরা। আমাদের দলে বুড়ি ফ্লোরা আর দুটো টগবগে কুকুর। বাড়িতে ফ্রান্সিস থাকল ওর মায়ের সঙ্গে। শুক্তি-শিকার করতে গিয়ে ওপাশের দ্বীপে সিংহ আর সিংহীর কবলে পড়লাম আমরা। দুটোকেই মারা হল, কিন্তু এই লড়াইতে প্রাণ হারাল আমাদের প্রিয় ফ্লোরা। প্রচুর মুক্তো সংগ্রহ করে বাড়ি ফিরে এলাম আমরা।' ফ্রিট্জ ফেরেনি, ও গেছে সেই নাবিকের খোঁজে।

কয়েকদিন কেটে যাওয়ার পরে ফ্রিট্জের মা ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। ফ্রিট্জ কেন ফিরছে না এখনও ? কোনো বিপদ হয়নি তো ওর !

ফ্রিট্জের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লাম আমরা। কিছুটা ঘোরাঘুরি করার পর পাওয়া গেল ওকে, আর পাওয়া গেল সেই ধোঁয়া-ওঠা পাহাড়। ওই পাহাড়ে নেমে ফ্রিট্জ গুলি ছুঁড়তেই গাছ থেকে নেমে এল এক তরুণ নাবিক। কাছাকাছি আসতেই দেখি, নাবিকটি ছেলে নয়, মেয়ে। অল্পবয়সী এই মেয়েটির নাম এমিলি মনট্রোজ।

আমাদের সঙ্গে বাড়ি ফিরে আসার পরে

এমিলি চমকপ্রদ এক কাহিনী শোনাল। এমিলির বাবার নাম উইলিয়াম মনট্রোজ, ভদ্রলোক ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর একজন মেজর। এখন ভারতবর্ষে আছেন। এমিলির মা মারা যাওয়ার পরে তিনি চেয়েছিলেন, এমিলি বোনের সঙ্গে ইংল্যাণ্ডে গিয়ে থাকুক। মেজরের এক বন্ধু ব্রিটিশ যুদ্ধজাহাজের ক্যাপ্টেন। এই ক্যাপ্টেনের সঙ্গে এমিলি পুরুষের ছদ্মবেশে ইংল্যাণ্ডের পথে রওনা হয়েছিল। যুদ্ধজাহাজে মেয়েদের যাওয়ার নিয়ম নেই বলেই পুরুষের ছদ্মবেশ নিতে হয়েছিল এমিলিকে। কিন্তু শেষ রক্ষা হল না। ঝড়ে জাহাজডুবি হল, আর ঢেউয়ের ধাক্কায় ভাসতে ভাসতে এমিলি এসে পড়ল আগ্নেয়গিরি-দ্বীপে। ওই দ্বীপে এমিলির সময় কাটত বনের পাখি পোষ মানিয়ে। শেষে, পোষা পাখির পায়ে-বাঁধা কাগজেই ওর বিপদের খবর পৌঁছে যায় ফ্রিট্জের হাতে।

এমিলি চট করে সুইস পরিবার রবিনসনের একজন হয়ে গেল। চমৎকার কেটে যাচ্ছিল আমাদের দিনগুলো। হঠাৎ ফ্রিট্জ একদিন ছুটে এসে খবর দিল, গভীর সমুদ্রে ও গুলির শব্দ শুনেছে। কী ব্যাপার ? দূরবিন চোখে লাগিয়ে দূরের সমুদ্রের দিকে তাকাতেই একটা জাহাজ দেখতে পেলাম। জাহাজের মাথায় ইংল্যাণ্ডের পতাকা।

বহু বছর আগে আমাদের সেই ভাঙা জাহাজ থেকে একটা কামান নামিয়ে এনেছিলাম আমরা। ছেলেদের বললাম, কামানটা দাগো। কামানটা দাগার একটু বাদেই গোলার আওয়াজে উত্তর এল। রীতিমত উত্তেজিত হয়ে আমরা নৌকো ভাসালাম সমুদ্রে।

নৌকো জাহাজের কাছাকাছি যেতেই জাহাজের ক্যাপ্টেন অবাক চোখে তাকালেন

আমাদের দিকে। জাহাজের নাম ইউনিকর্ন। ক্যাপ্টেন সযত্নে তাঁর জাহাজে তুলে নিয়ে আমাদের কাহিনী শুনলেন। তারপর এক-এক করে পরিচয় করিয়ে দিলেন অনেকের সঙ্গে। উলটন পরিবারটিকে আমাদের খুব ভাল লেগে গেল.। এঁরা ইংরেজ।

মিস্টার উলটনের শরীর-স্বাস্থ্য বেশ ভেঙে গিয়েছিল। আমরা বললাম, আসুন না, আমাদের বাড়িতে এসে সামান্য বিশ্রাম নিয়ে যান। ভাল লাগবে আপনাদের।

রাজি হয়ে গেলেন উলটনরা। দ্বীপে আসার পরে এখানকার স্বাস্থ্যকর

এরপর **ট্রেজার আইল্যাণ্ড**

আবহাওয়ায় মিস্টার উলটন বেশ সুস্থ বোধ করলেন। তারপরেই বলে বসলেন, "এখানে থেকে গেলে কেমন হয়?"

আমরা বললাম, "খুব ভাল।"

পরে আমি আমাদের ছেলেদের ডেকে বললাম, "এবার তোমাদের কী ইচ্ছে বলো। এখানে বাকি জীবনটা কাটাবে, না ইউরোপে যাবে?"

ফ্রিট্জ জানাল, ওর ইউরোপ দেখার খুব শখ। আমি বললাম, "বেশ, তবে যাও।"

এমিলিও ইংল্যাণ্ডে ওর বাবার কাছে ফিরে যেতে চায়।

কয়েকদিন বাদে আমরা এমিলি আর ফ্রিট্জকে ইউনিকর্নে তুলে দিলাম।

ইউনিকর্ন চলে যাবার পরে আস্তে আস্তে আরও অনেকগুলো বছর কেটে গেল। এই দ্বীপের জনসংখ্যা এখন দু-হাজারেরও বেশি। আসলে, ইউনিকর্নের নাবিকদের মুখে-মুখে আমাদের কথা ছড়াবার পরে এক-এক করে অনেকে এসে এই দ্বীপের বাসিন্দা হয়ে গেছেন। আমি আর আমার বউ এখন বেশ বুড়ো হয়ে গিয়েছি, কিন্তু সেই আগের মতোই দিব্যি সুখে-শান্তিতে দিন কেটে যাচ্ছে আমাদের। বিদায় ইউরোপ! বিদায় প্রিয় সুইজারল্যাণ্ড! আর কখনোই তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে না। কিন্তু প্রার্থনা করি, তোমরা ঠিক আমাদের মতো সুখে দিন কাটাও! (সমাপ্ত)

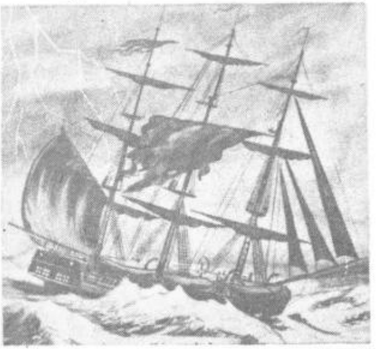

যোহান রুডলফ উইস (১৭৮২-১৮৩০): প্রখ্যাত সুইস লেখক উইস 'সুইস ফ্যামিলি রবিনসন'-এর গ্রন্থকার হিসেবে জগদ্বিখ্যাত। এই বইটি আসলে লিখতে শুরু করেছিলেন তাঁর বাবা, যোহান ডেভিড উইস (১৭৪৩-১৮১৮)। অ্যাডভেঞ্চার-কাহিনীটি লেখার পেছনে তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ছেলেদের আনন্দ দেওয়া, কিন্তু বইটি তিনি শেষ করে যেতে পারেননি। তিনি মারা যাওয়ার পরে বইটি শেষ করেন তাঁর সুযোগ্য ছেলে যোহান রুডলফ উইস। তারপর আগাগোড়া পরিমার্জনা করে ছাপতে দেন। বইটির প্রথম প্রকাশ জার্মান ভাষায়। এরপর এক-এক করে নানা ভাষায় অনূদিত হয়। ড্যানিয়েল ডিফোর 'রবিনসন ক্রুসো'র আদলে লেখা হলেও 'সুইস ফ্যামিলি রবিনসন' অন্য ধরনের স্বাদ ও বৈশিষ্ট্যের জন্যে আজও সমান আগ্রহে পঠিত হয়। দর্শনের অধ্যাপক ও লোকগাথার সংগ্রাহক উইস সুইজারল্যাণ্ডের জাতীয় সঙ্গীতের রচয়িতা।

"কত রকমের খেয়ালি লোকই না থাকেন।" ছোট্‌কা বলছিল, "এই ধর না, আমাদের অফিসের মৈত্রসাহেবের কথা। সেদিন আমায় ডেকে তাঁর তৈরি বিচিত্র একটা উইল দেখালেন। তারপর প্রশ্ন করলেন, আমি এর সমাধান করতে পারব কি না।"

"তুমি কী বললে?" জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

ছোট্‌কা একটু হাসল। তারপর বলল, "আপনার উইল নিয়ে কোনো মন্তব্য করব না। তবে এটা উইলের চেহারায় আমার কাছে একটা ধাঁধার মতো। আর ধাঁধাটাও বেশ মজাদার। তাই এটার সমাধান আমায় করতেই হবে।"

"করলে?" আমি আবার প্রশ্ন করলাম।

"করলাম।" ছোট্‌কা ছোট করে জবাব দিল। তারপর টেবিল থেকে একটা ছাইরঙের কলম তুলে নিয়ে আমার হাতে দিয়ে বলল, "মৈত্রসাহেব এই কলমটা খুশি হয়ে প্রেজেন্ট করলেন।"

ভারী সুন্দর দেখতে কলমটা। সব থেকে নতুন লাগল, কালি ভরার কায়দাটা। নিজের থেকেই কালি ভরে যায়। শুধু দোয়াতে ডুবিয়ে রাখা কলমটা, কিছুটা সময় অপেক্ষা করা।

সেই কলমেই লিখে নিলাম ধাঁধাটা।

প্রথম ধাঁধা॥ এক ভদ্রলোক দশ হাজার টাকা তাঁর তিন মেয়ে আর তিন জামাইয়ের মধ্যে ভাগ করে দিতে চান। সমান তিন বা ছ ভাগ নয়, ভাগে একটু হিসেব রয়েছে।

তিন মেয়ে মোট পাবে ৩,৯৬০ টাকা। জলি কলির থেকে ১০০ টাকা বেশি পাবে, মলি পাবে জলির থেকেও ১০০ টাকা বেশি।

অরুণ সান্যাল পাবে তার স্ত্রীর প্রাপ্যের ৫০ শতাংশ বেশি। হিরণ মিত্র পাবে তার স্ত্রীর সমান টাকা। তপন হাজরা পাবে তার স্ত্রীর ভাগের টাকার দ্বিগুণ টাকা।

এ থেকে বলতে হবে, তিন মেয়ের পদবি কী?

কে কত পাবে, সেটা বার করলেই বেরিয়ে আসবে তিন মেয়ের পদবি। সুতরাং করে ফেলো।

দ্বিতীয় ধাঁধা॥ বন্ধনীর মধ্যে উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে বন্ধনীর বাইরে বাঁ দিকের শব্দ সম্পূর্ণ করো, ডান দিকের শব্দের শুরুতে বসে সেটাও যাতে অর্থপূর্ণ শব্দ হয়ে ওঠে তাও লক্ষ রেখো

নিদ্রা(—)ভূষা

তৃতীয় ধাঁধা॥ জট ছাড়াও—দি চ ল জ ট

গতবারের উত্তর॥ (১) মুরগি ৫, হাঁস ২০ ছিল। হাঁস বেড়েছে ৫ গুণ। অর্থাৎ এখন ১০০+২০=১২০টা। মুরগি বেড়েছে ১৫ গুণ। তাই এখন মুরগির মোট সংখ্যা ৭৫+৫=৮০। সব মিলিয়ে ২০০।

(২) জল(চল)মান। (৩) বীরপুরুষ।

সত্যসন্ধ

শব্দ-সন্ধান

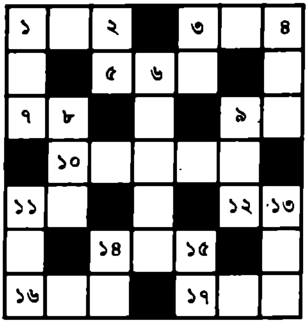

সংকেত : পাশাপাশি : (১) ঝাণ্ডা। (৩) গৌরী-জননী। (৫) সর্পরাজ। (৭) ভারতের এক বিশেষ ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়। (৯) কোনো কোনো নৌকোয় থাকে, আগে জাহাজেও থাকত। (১০) মিথ্যা ওজর। (১১) দীর্ঘ তৃণবিশেষ। (১২) নৌকাবাহক। (১৪) সাপ। (১৬) বিদ্যাসাগর যা ছিলেন। (১৭) মধ্যবর্তী।

উপর-নীচ : (১) ঐতিহাসিক স্থান। (২) বিখ্যাত মসজিদ। (৩) নকল। (৪) মাথামোটা মাছ। (৬) বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। (৮) জন্তুবিশেষ। (৯) কোন্ খালের পা তোলা ? (১১) সংগীতের একটি রাগ। (১৩) নদীর নাম। (১৪) মুখের মঙ্গলধ্বনি। (১৫) শস্য, ওলটালে দস্যু।

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার সমাধান

মজার খেলা

২৬টা দেশলাই-কাঠি দিয়ে টেবিলে নীচের ছবির মতো একটা ছবি তৈরি করে বন্ধুদের সামনে রাখো—

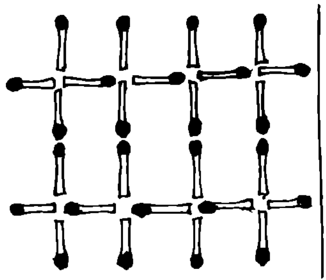

এবার বন্ধুদের বুঝিয়ে বলো, কী করতে হবে।

করতে হবে যা, তা হল, এর মধ্য থেকে ১৪টা কাঠি সরিয়ে এমনভাবে ফের বসাতে হবে, যাতে তিনটে বর্গক্ষেত্র তৈরি হয়। সমান মাপের বর্গক্ষেত্র নয়, যে-কোনো মাপের।

অন্যান্য খেলার মতোই, এটাও প্রথমে নিজে চেষ্টা করে দেখতে হবে। শুধু যাতে বন্ধুদের সামনে কেউ লজ্জায় না পড়ে, সেজন্য একটা সমাধান নীচে দেখিয়ে দিচ্ছি—

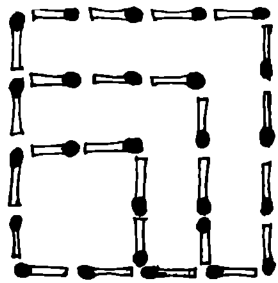

মজারু

কিসের ফোটো

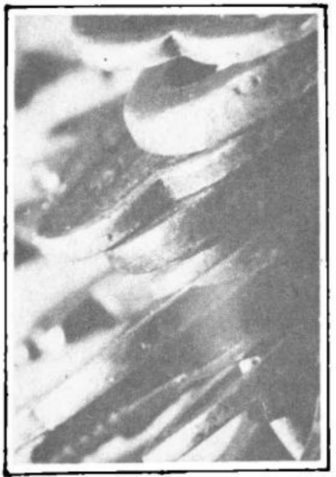

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যায় ছিল বাঘের মাথার ফোটো।

ফোটো : তপন দাশ

উত্তর বটে

প্রঃ চশমা হারিয়ে গেছে তো খুঁজছ না কেন ?
উঃ বাঃ, চশমা না পরে খুঁজব কী করে ?

প্রঃ এত বিচ্ছিরি হাতের লেখা ছাপাখানার লোকেরা তো পড়তেই পারবে না, কবিতাটা টাইপ করে আনতে পারেননি ?
উঃ আমি যদি টাইপ করতে জানতাম, তবে কি আর কবিতা লিখতাম।

প্রঃ এতকাল পরে প্রাণের বন্ধুর সঙ্গে দেখা হল, আর রেস্টুরেণ্টে গিয়ে দুজনে মিলে মাত্র পাঁচ টাকা খরচ করলে ?
উঃ এর বেশি যে ছিল না বন্ধুর কাছে।

প্রঃ চশমা নিলেও তুমি বই পড়তে পারবে কিনা এ সন্দেহ তোমার হল কী করে ?
উঃ আজ্ঞে ডাক্তারবাবু, আমি অক্ষর চিনি না যে।

সুসেন

হাসিখুশি

"বলো তো পাপান, মধ্যযুগকে 'তমসাচ্ছন্ন যুগ' বলা হয় কেন ?"

"সেই সময় নাইটের রাজত্ব চলছিল বলে।"

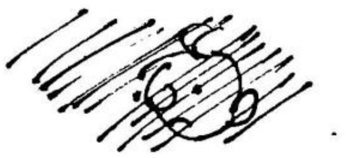

"নাইরোবিতে দশদিন ছিলাম। একদিনও আমি সূর্যের আলো দেখতে পেলাম না।"

"সেইজন্যই তো জায়গাটার নাম নাইরোবি।"

"দেখুন ডাক্তারবাবু, আমার ছেলে বলছে, আমার অপারেশনটার জন্য আপনি বড় বেশি ফি নিয়েছেন।"

"আপনার ছেলের কাছে আপনার জীবনটা শস্তা হতে পারে, কিন্তু আমি ডাক্তার, রোগীর জীবনটাকে তো তুচ্ছ মনে করতে পারি না।"

"আমার বাবা গান গাইতেন, কিন্তু বৃদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গান গাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন।"

"তাহলে ভেবে দ্যাখো, বৃদ্ধ হওয়ার কতখানি উপকারিতা।"

ছবি অহিভূষণ মালিক

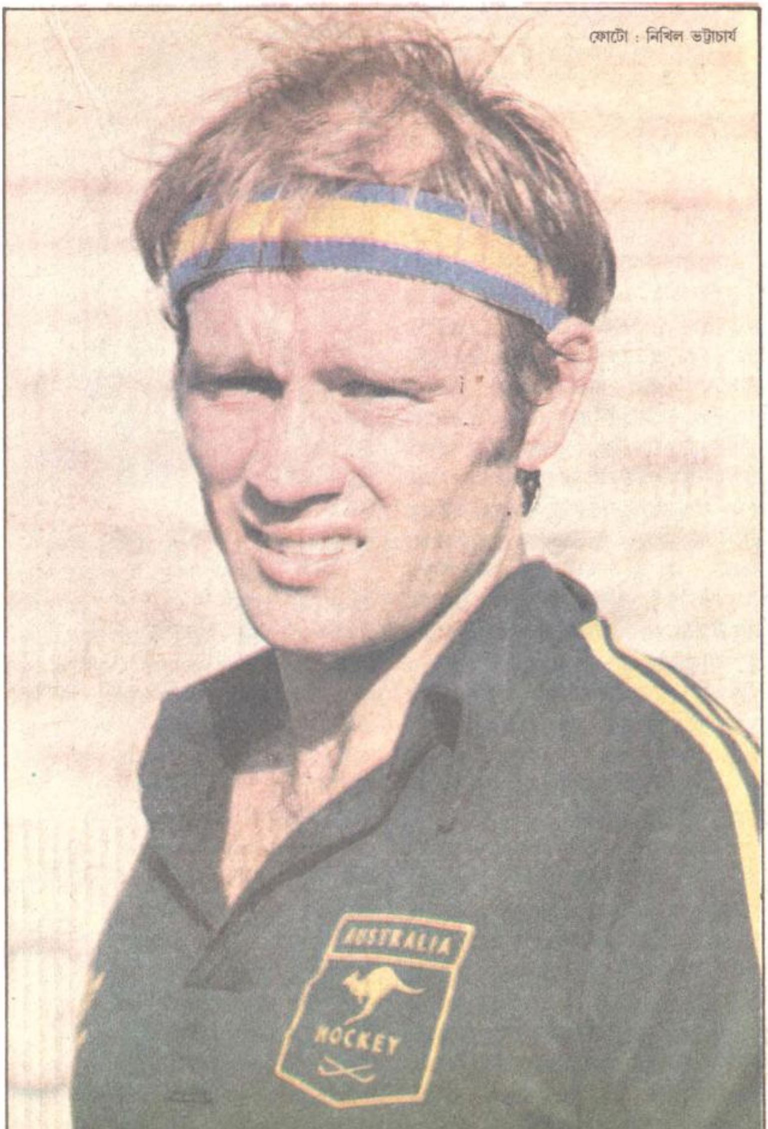

অস্ট্রেলিয়ার হকি-ক্যাপ্টেন **রিক চার্লসওয়ার্থ** (পাতা ওলটালেই খেলার খবর)

হকিতে ভারতের ভরাডুবি

মণি শর্মা

কুয়ালালামপুরে পঞ্চদেশীয় হকি প্রতিযোগিতায় পাকিস্তানকে হারিয়ে অস্ট্রেলিয়া চ্যাম্পিয়ান হয়েছে। খেলার আঠারো মিনিটে টেরি ওয়ালশ দলের পক্ষে জয়সূচক গোল করেন। এর আগের খেলাতেও অস্ট্রেলিয়া ৪—২ গোলে পাকিস্তানকে হারিয়ে দিয়েছিল। সবাই ভেবেছিল, ফলাফলটা অস্বাভাবিক। কিন্তু চূড়ান্ত পর্যায়ে আবার পাকিস্তানকে হারিয়ে দিয়ে অস্ট্রেলিয়া প্রমাণ করেছে, এখন হকিতে তারা বিশ্বের অন্যতম সেরা দল।

তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান নির্ধারণের খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল ভারত ও মালেশিয়া। এ-খেলায় ভারত মালেশিয়াকে ৫—০ গোলে হারিয়ে দিয়ে তৃতীয় স্থান অধিকার করে। মালেশিয়া চতুর্থ স্থান পেয়েছে। বিরতির সময় ভারত ৪—০ গোলে এগিয়ে ছিল। পঞ্চম বা সর্বনিম্ন স্থান অধিকার করেছে নিউজিল্যাণ্ড।

আমাদের দুঃখ এই যে, ভারত চ্যাম্পিয়ান হতে পারল না। হকি খেলায় পাকিস্তান ও ভারত পৃথিবীর দুটি সেরা দল হিসেবে পরিচিত। ভারত ও পাকিস্তান কোনো প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করলে আশা করা হয়, এই দুই বাঘের মধ্যে কোনো একজন চ্যাম্পিয়ান হতে যাচ্ছে, অন্যজন রানার্স। দীর্ঘদিন ধরে এই ছবি দেখতে আমরা অভ্যস্ত। কিন্তু কুয়ালালামপুরে ঘটে গেল উলটো ঘটনা। ভারত ভাল খেলতে পারেনি। পাকিস্তান অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরে রানার্স হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার চ্যাম্পিয়ন হওয়াটা একেবারে অপ্রত্যাশিত ছিল।

টেরি ওয়ালশ

অথচ কুয়ালালামপুরে যাওয়ার আগে ভারতের প্রধান কোচ ও ম্যানেজার বালকিষেন সিং জোর দিয়ে বলেছিলেন, ভারত ভাল ফল করবেই। সামনে লস এঞ্জেলিস অলিম্পিক। অলিম্পিকে জয়ী হওয়ার জন্য ভারতীয় হকি সংস্থা একটি দুর্দান্ত দল গঠনের চেষ্টায় রয়েছেন। অলিম্পিকের জন্য চমৎকার দল তৈরি করার জন্যে খেলোয়াড়দের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে হবে। পঞ্চদেশীয় হকি প্রতিযোগিতা এ-ব্যাপারে আমাদের খুবই সাহায্য করবে। তারপর পেণ্টাঙ্গুলার হকিতে ভারত কী করেছে তোমরা সবাই তা জানো। নিশ্চয়ই এটাকে অলিম্পিক জয়ের পক্ষে শুভলক্ষণ বলা চলে না। এতদিনের ক্যাম্প, এত বাছাবাছি, এত ট্রেনিংয়ের পরে ভারতের খেলোয়াড়দের যে খেলা দেখা গেল, তাতে কি লস এঞ্জেলিসে সাফল্যের স্বপ্ন দেখা যায়? বোধহয় না।

বালকিষেন সিং কী বলেন?

‘নো’ বলে জয়

দিলীপ দত্ত

আম্পায়ার ডাকলেন ‘নো’ বল। সঙ্গে সঙ্গে খেলা শেষ। গত সিরিজে ব্রিজটাউন টেস্টে ভারতের বিপক্ষে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল দশ উইকেটে জয়লাভ করেছে। তাদের জয়সূচক রানটি এসেছে ‘নো’ বলের কল্যাণে।

দু-দলের রানসংখ্যা সমান সমান। জয়লাভের জন্য একটি রানের প্রয়োজনে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের দুই নিয়মিত ওপেনিং ব্যাটসম্যান ব্যাট করতে নামলেন। ভারতীয় দলের বোলিং শুরু করতে দেওয়া হল উইকেটরক্ষক কিরমানিকে। উইকেটরক্ষকের প্যাড পরে নামলেন যশপাল শর্মা। মাইকেল হোল্ডিং যতটা দূর থেকে দৌড়ে এসে বল করেন কিরমানিও ততটা দৌড়ে এসে বল করলেন। প্রথম বলে রান হল না, দ্বিতীয় বলটি আম্পায়ার ডাকলেন ‘নো’ বল। ব্যস, খেলা শেষ।

টেস্ট ক্রিকেটে ‘নো’ বলে জয়লাভের নজির আর একটি আছে। ১৯৭৩ সালে মাদ্রাজ টেস্টে ভারতীয় দল ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে জয়লাভ করে। জয়সূচক রানটি এসেছিল একটি ‘নো’ বলের মাধ্যমে। খেলাটিও শেষ হয়েছিল প্রবল উত্তেজনার মধ্যে। জয়লাভের জন্য ৮৬ রানের প্রয়োজনে ভারতীয় দল চতুর্থ ইনিংসে ব্যাট করতে নামে। আঙুলে আঘাতের জন্য গাভাসকর ইনিংস সূচনা করেননি। ইনিংস শুরু করেছিলেন চেতন চৌহান ও ফারুক ইঞ্জিনিয়ার। কিন্তু এগারো রানের মধ্যে ইঞ্জিনিয়ার ও অজিত ওয়াদেকর আউট হয়ে যান। চতুর্থ দিনের শেষে রান হয় ২ উইকেটে ৩৪। পঞ্চম দিনে ৪৪ রানে চৌহান, ৫১ রানে বিশ্বনাথ, ৬৭ রানে দুরানি এবং ৭৮ রানে সোলকার আউট হন। ভারতের রান ৬ উইকেটে ৭৮, গাভাসকর এসে যোগ দিলেন পতৌদির সঙ্গে। পতৌদি গিফোর্ডের বলে একটি রান নিলেন। আঘাতপ্রাপ্ত গাভাসকরকে সেই ওভারের পাঁচটি বল খেলতে হল। পোককের পরের ওভারে পতৌদি সুইপ করে ৪ পেলেন, তারপর কাট করে ২। রান হল সমান সমান। জয়সূচক স্ট্রোকটির জন্য দর্শকরা উল্লসিত হয়ে অপেক্ষা করছেন। গাভাসকর গিফোর্ডের পাঁচটি বল খেললেন, ষষ্ঠ বলটি আম্পায়ার মামসা ডাকলেন ‘নো’ বল।

জয়লাভের জন্যে শেষ ইনিংসে একটি রানের প্রয়োজন ছিল আর একটি টেস্টে। ১৯৩২-৩৩ সালে সিডনি টেস্টে একটি অমর ইনিংস খেলেছিলেন অস্ট্রেলিয়ার স্টান ম্যাক্‌কেব। লারউডের দুরন্ত বোলিংয়ে যখন অস্ট্রেলিয়া দল বিপর্যস্ত তখন ম্যাক্‌কেব ইংল্যাণ্ড দলের বোলিংকে ছত্রভঙ্গ করে রান করেছিলেন ১৮৭ নট-আউট। সেদিন ম্যাককেবের বাবা-মা খেলা দেখতে এসেছিলেন। শোনা যায় ম্যাককেব ব্যাট করতে যাবার সময় বাবাকে বলেছিলেন, “আমার যদি আঘাত লাগে মা যেন ছুটে মাঠে না চলে যায়।” কিন্তু ম্যাক্‌কেবের সেই অবিস্মরণীয় ইনিংস অস্ট্রেলিয়া দলকে পরাজয়ের হাত থেকে বাঁচাতে পারেনি। অস্ট্রেলিয়া দল প্রথম ইনিংসে করেন ৩৬০ রান, ইংল্যাণ্ড ৫২৪। চতুর্থ দিনে অস্ট্রেলিয়া দলের যখন ১৬৪ রানের মাথায় শেষ উইকেট পড়ল, তখন ইংল্যাণ্ড দলের ইনিংস শুরু করার আর সময় ছিল না।

মাত্র একটি রানের জন্যে পঞ্চম দিনের খেলা শুরু হল। ম্যাক্‌কেবের প্রথম বলটিতেই সার্টক্লিফ্ প্রয়োজনীয় রানটি করলেন। সেদিন মাঠে দর্শক উপস্থিত ছিলেন মাত্র একজন।

জ্যাঠামশাইয়ের বাড়ি

সুমন চট্টোপাধ্যায়

প্রশান্তবাবু যখন মফস্বলের কলেজে অধ্যাপনা করতেন, সরকার তখন তাঁকে ন্যায্য দামে সল্ট লেকে দু-কাঠার একটা ছোট প্লট দিতে চেয়েছিল। কিন্তু প্রশান্তবাবু সরকারের সে-উপহার গ্রহণ করতে পারেননি। চাকরির তাগিদে সারাটা জীবন তিনি এক মফস্বল শহর থেকে অন্য মফস্বল শহরে ঘুরে বেড়িয়েছেন ; কলকাতায় বাসা বানিয়ে থাকার কথা কখনও স্বপ্নেও ভাবেননি।

সেই প্রশান্তবাবুকে এখন কলকাতায় থাকতে হয়। সরকার তাঁকে কলকাতার কলেজে বদলি করেছেন। প্রশান্তবাবুর বয়েস ষাট ছুঁই-ছুঁই ; অতএব আর তাঁকে বাক্স-প্যাঁটরা গুছিয়ে মফস্বলের কলেজে পাড়ি দিতে হবে না। বাকি কর্মজীবনটুকু ইচ্ছেয় হোক, অনিচ্ছেয় হোক, তাঁকে কলকাতাতেই কাটাতে হবে।

সারাটা জীবন প্রশান্তবাবু ভাড়াবাড়িতে কাটিয়েছেন। কোনো বাড়িতেই বাড়িওয়ালার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক শেষ পর্যন্ত মধুর থাকেনি। কলকাতায় যাঁর বাড়িতে প্রশান্তবাবু ভাড়া থাকেন শুনেছি তিনি অতি দজ্জাল মানুষ। প্রশান্তবাবু তাই ভাড়া বাড়িতে থাকবেন না বলে প্রতিজ্ঞা করেছেন। ওঁর বাড়িতে গেলে প্রায়ই আমাকে বলেন, 'দাও না বাপু একটা জমি-টমি খুঁজে।'

চেষ্টা করলে কলকাতাতেও যে জমি পাওয়া যায় না এমন নয়। কিন্তু জমির দামের সঙ্গে প্রশান্তবাবুর ব্যাঙ্ক ব্যালানস পাল্লা দিতে পারে না। তিনি সারা জীবন অধ্যাপনা করেছেন, বিশ্বাস করে এসেছেন সিম্পল লিভিং হাই থিঙ্কিংয়ে। আইনে বাধে বলে কখনও প্রাইভেট-টুইশানি পর্যন্ত

করেননি।

সেই প্রশান্তবাবু আবার সল্ট লেকে জমি পেলেন! ওঁর বাড়িতে গিয়ে শুনি, হাজার-হাজার দরখাস্তের মধ্যে থেকে লটারির খাতায় তাঁর নাম উঠেছে। প্রশান্তবাবু তো আহ্লাদে আটখানা। আমি বললাম, "জ্যাঠামশাই, আপনি দেখছি বিশেষ ভাগ্যবান, এবার একটা লটারির টিকিট কেটে ফেলুন। জমি তো পেয়েই গেছেন, এবার বাড়ি তৈরির খরচাও উঠে যাবে।"

প্রশান্তবাবুর সঙ্গে আমাদের বাড়ির সম্পর্ক অনেকদিনের। সেই যবে আমাদের দুই বাংলা একদেশে ছিল তবে থেকে। বাবার মুখে শুনেছি প্রশান্তবাবুর বাবা এবং আমার দাদু ফরিদপুরের একই গ্রামে পাশাপাশি বাড়িতে থাকতেন। প্রশান্তবাবু আমার বাবার চেয়ে বয়সে একটু বড়। আমরা সব ভাইবোন তাই তাঁকে জ্যাঠামশাই বলে ডাকি।

জ্যাঠামশাইকে আমি বিশেষ শ্রদ্ধা করি। মনে আছে, ছোটবেলায় ভীষণ ভয়ও পেতাম ; ওঁর চেহারাটা ছিল অসম্ভব গম্ভীর আর থমথমে। তাই খুব একটা ধারে-কাছে ঘেঁষতাম না। মফস্বলে জ্যাঠামশাইয়ের বাড়িতে বেড়াতে গেলে আমার বেশিরভাগ সময় কাটত সুদীপদার ঘরে। সুদীপদা জ্যাঠামশাইয়ের একমাত্র ছেলে, যেমন পড়াশুনায় ভাল তেমনি গানবাজনায় ওস্তাদ। ছোটবেলায় সুদীপদাই ছিল আমার গুরু। এখন ও আমেরিকায় থাকে।

আমি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ি বলে জ্যাঠামশাই বললেন, "সন্তু, প্লট বাছাইয়ের দিন আমার সঙ্গে যাস। ওসব টেকনিকাল

ব্যাপার, আমার মাথায় কিছু ঢুকবে না।"

জ্যাঠামশাই আমাকে এতখানি গুরুত্ব দেবেন কখনও ভাবিনি। আমি বললাম, "নিশ্চয়ই যাব জ্যাঠামশাই।"

"দুপুর একটায় হাজিরা দিতে লিখেছে। তুই সকাল-সকাল আমার এখানে চলে আসিস, একসঙ্গে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাব।"

"বেশি তাড়াতাড়ি গিয়ে কী হবে জ্যাঠামশাই, নির্দিষ্ট সময়ের আগে গেলেই তো হল।"

"ও তুই বুঝবি না। হয়তো গিয়ে দেখব দু'ঘন্টা আগে এসে লোকে লাইনে দাঁড়িয়ে পড়েছে। এই দ্যাখ না, জমির চিঠি পাওয়ার ঠিক পরের দিন সকালে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিতে গিয়ে শুনি আমার আগেই নাকি পঞ্চাশজন টাকা জমা দিয়ে দিয়েছে।"

জ্যাঠামশাইয়ের সব কাজই এইরকম। বাড়ি থেকে ট্রেনে করে কেউ হয়তো বাইরে কোথাও যাবে; ট্রেন যদি হয় সন্ধে ছ'টায় উনি বিকেল তিনটে থেকে তাড়া লাগাতে থাকেন। বাড়ি মাথায় করে বারবার বলতে থাকেন, "তৈরি হয়ে নাও, তৈরি হয়ে নাও, রাস্তাঘাটের যা অবস্থা, হয়তো হাওড়া ব্রিজটা মালপত্র মাথায় করে হেঁটেই পার হতে হবে।"

নির্ধারিত দিনে সেচভবনে গিয়ে দেখি জ্যাঠামশাইয়ের কথা মিথ্যে নয়। আমাদের আগেই অন্তত শ'খানেক মানুষের ভিড় সেখানে জমে গেছে। দলে দলে ভাগ হয়ে তাঁরা কয়েকটা টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে কী যেন দেখছেন। কাছে গিয়ে দেখলাম, জমির ম্যাপ।

জ্যাঠামশাইয়ের পুব-দক্ষিণ খোলা কর্নার প্লট চাই। আমার যতটুকু বিদ্যে তার সবটুকু ম্যাপে নিয়োগ করে জ্যাঠামশাইয়ের জন্য কয়েকটা পুব-দক্ষিণ খোলা জমি বাছলাম। বেছে নিয়ে জ্যাঠামশাইকে ম্যাপটা বোঝাচ্ছি, পাশ থেকে এক ভদ্রলোক বলে উঠলেন, "দাদা, দেখে আর কী হবে, ওগুলো সব কালকেই বিক্রি হয়ে গেছে।"

"অ্যাঁ, কী বললেন?" কিছুটা রাগত গলায় জ্যাঠামশাই প্রশ্ন করলেন ভদ্রলোককে।

"বাইরে গিয়ে দেখুন, দেওয়ালে কালকে বিক্রি হয়ে যাওয়া প্লটের লিস্ট টাঙিয়ে দিয়েছে।"

লিস্ট দেখে ফিরে এসে দাঁতে দাঁত ঘষতে ঘষতে জ্যাঠামশাই বললেন, "কালবিলম্ব না করে এই বুড়ো বয়সে দৌড়ঝাঁপ করে এলাম, আর সব ভাল-ভাল প্লট কিনা অন্যেরা নিয়ে নিয়েছে।"

সান্ত্বনা দিয়ে আমি বললাম, "কী আছে জ্যাঠামশাই, পুব-দক্ষিণ না পান, দক্ষিণ-পশ্চিম খোলা তো পাবেন। আর প্লটই তো সব নয়, প্ল্যানের উপরেও তো অনেক কিছু নির্ভর করে।"

জ্যাঠামশাই কোনো উত্তর দিলেন না। তন্নতন্ন করে খুঁজে আমি দক্ষিণ-পশ্চিম খোলা একটা কর্নার প্লট বাছলাম এবং জ্যাঠামশাই সেই প্লটটাই নিলেন।

সেচভবন থেকে ফেরার পথেই দেখলাম জ্যাঠামশাইয়ের রাগ পড়ে গেছে। আমাকে বললেন, "সন্তু, এবার একটা ফার্স্ট ক্লাস প্ল্যান কর। দেখিস ঘরে যেন একটু আলো-হাওয়া খেলে। বুঝলি না, সারাটা জীবন তো ভাড়া-বাড়িতেই কাটালাম। তা মফস্বলে যখন চাকরি করতাম রোদ-হাওয়ার সঙ্গে মিলেমিশে থাকা যেত। কলকাতার ভাড়াবাড়ির সঙ্গে তো সূর্যদেব আর পবনদেব যেন পরামর্শ করে মুখ দেখাদেখি বন্ধ করেছেন।"

সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র আমি। জ্যাঠামশাইয়ের বাড়ির প্ল্যানটা তাই খুব মন দিয়েই তৈরি করলাম। দুটো বেড-রুম, দক্ষিণ খোলা, একটা স্টাডি,

ডাইনিং স্পেস, রান্নাঘর আর বাগান করার মতো বাড়ির সামনে একচিলতে জায়গা।

প্ল্যান দেখে জ্যাঠামশাই বললেন, "বেশ হয়েছে। আমরা তো মাত্র দুটি প্রাণী, আমি আর তোর জ্যাঠাইমা। সাতমহলা প্রাসাদ দিয়ে আমরা কী করব?"

আমি বললাম, "বাড়ি শুরু করছেন কবে?"

"এই বর্ষাটা পার হলেই করব।"

জ্যাঠামশাইয়ের বাড়িতে তারপর অনেকদিন যাওয়া হয়নি। ফাইনাল পরীক্ষা এসে গিয়েছিল, বাড়ি থেকে তাই খুব একটা বের হতাম না। পরীক্ষা সবে শেষ হয়েছে, বাবা একদিন অফিস থেকে ফিরে বললেন, "সন্তু, জ্যাঠামশাইকে কাল সকালে একটু এয়ারপোর্টে পৌঁছে দিও।"

"এয়ারপোর্ট? কেন সুদীপদা আসছে?"

"না, প্রশান্তদাই সুদীপের কাছে যাচ্ছেন। সুদীপ বাবা-মাকে ওর ওখানেই রাখতে চায়।"

ট্যাক্সি করে দমদম যাওয়ার পথে জ্যাঠামশাইকে প্রশ্ন করলাম, "আপনার বাড়ির কী হবে?"

"ফিরে এসে করব।" ধরা গলায় জ্যাঠামশাই জবাব দিলেন।

পাঁচ বছর হয়ে গেল জ্যাঠামশাই সান ফ্রান্সিসকোতেই আছেন। প্রথম-প্রথম বাবার কাছে বাড়ি করা হল না বলে আক্ষেপ করে চিঠি লিখতেন। কিন্তু আক্ষেপ করলেও জ্যাঠামশাইয়ের আর বাড়ি করা হবে না। পাঁচ বছর জমি ফেলে রাখার জন্য সরকার তাঁর জমি বাজেয়াপ্ত করে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে আমেরিকায় চিঠি লিখেছে।

সেই চিঠি সই করেছি আমি। আমি এখন সল্ট লেক ডেভালপমেন্ট প্রোজেক্টের একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার।

ছবি: সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

এই সেরেছে

ধীরেন করগুপ্ত

এই সেরেছে, হারিয়ে গেল—
পড়ার বই আর অঙ্কখাতা।
খাটের 'পরে রেখেছিলাম
খুঁজতে গিয়ে ঘুরছে মাথা।
পানিপথের যুদ্ধ কবে
হচ্ছিল কোন রাজার সাথে—
স্যার বলেছেন, ভাল করে
মুখস্থটা করবি রাতে।
ভূগোলটা তো ঘুরছে মাথায়
কোন্ ফাঁকে তা কখন পড়ি?
অঙ্কবইটা হারিয়ে গেছে—
কেমন করে অঙ্ক করি!
বাংলাটা তো জলের মতন
দিদির কাছে পড়ব বসে!
সব পড়াটা হলেই তবে—
ইংরেজিটা ধরব কষে।
হারিয়ে গেছে বলেই না আজ
বইগুলো সব হয়নি পড়া।
আমার মতন ক'জন পারে
রোজ সকালে পড়া করা?

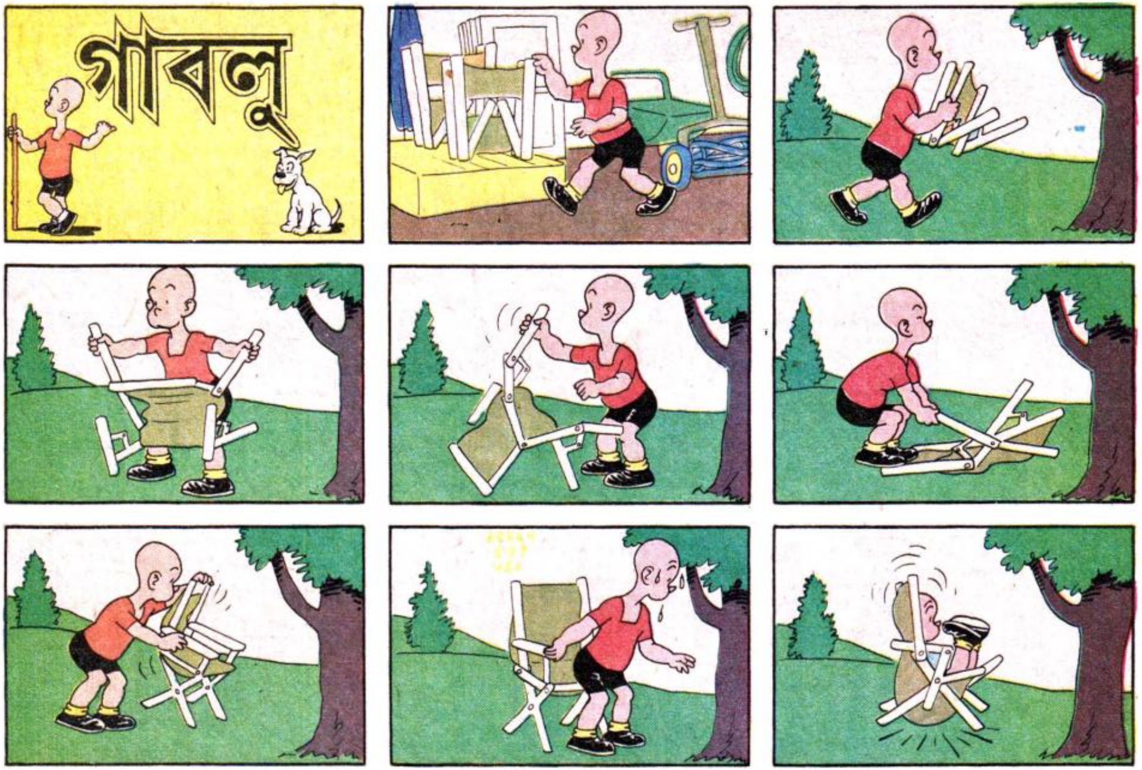
গাবলু

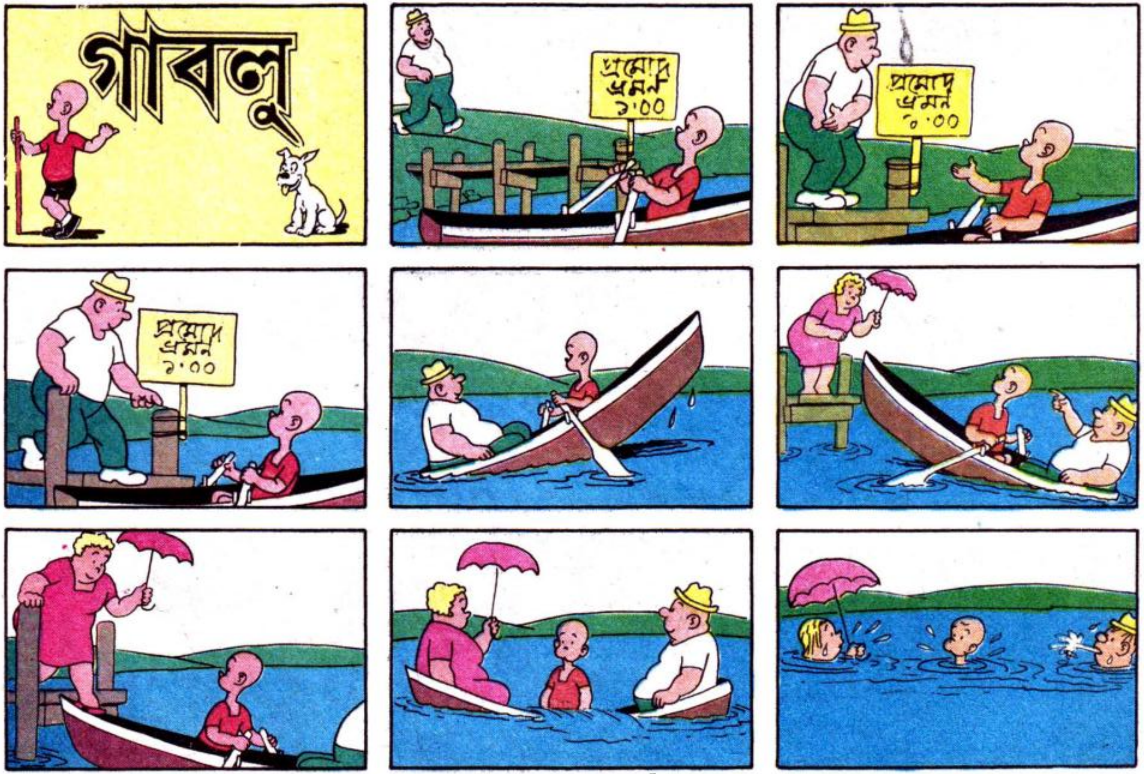
গাবলু
প্রমোদ ভ্রমন
১'০০
প্রমোদ ভ্রমন
প্রমোদ ভ্রমন

ব্যাঙের শুদ্ধ ভাষা

বাচস্পতি

এ-বাড়িতে ভাষাবিজ্ঞানের আসর বসার পর থেকে ১২৭তম কাপটির কালো কফি নিঃশেষ করে হিগিনকাকু বললেন, "এবার একটু ব্যাঙেদের ভাষাতত্ত্ব আলোচনা করা যাক।"

"অস্যার্থ ?" (তার মানে ?) বাবা জিজ্ঞেস করলেন।

"এই ঙ-র ব্যাপারটা। আমরা যারা বাঙাল, কিংবা যারা ধরো মেদিনীপুর অঞ্চলের মানুষ—আমাদের অনেকে ঙ-র ঠিক-ঠিক উচ্চারণ করতে পারি না, একটু ঝামেলায় পড়ি।"

ভণ্টু বলল, "ঙ নিয়ে আবার কী ঝামেলা হল ?"

"বলছি বাছা, বলছি। বলতে হবে 'ঙ', তা না বলে আমরা বলি 'ঙ্গ', অর্থাৎ 'ঙ' প্লাস 'গ'। আমরা 'রাঙাদি' বলতে পারি না, বলি 'রাঙ্গাদি' [রাঙ্‌গাদি], 'ডাঙা' বলতে পারি না, বলি 'ডাঙ্গা' [ডাঙ্‌গা], 'রঙিন' বলতে গিয়ে বলি 'রঙ্গিন' [রঙ্‌গিন]—বুঝতে পারছ ঝামেলাটা কোথায় ?"

বাবা বললেন, "দাঁড়া, দাঁড়া—মনে হচ্ছে একটা এক্‌সট্রা 'গ' চলে আসছে।"

হিগিনকাকু ভণ্টুর বাবার মুখের দিকে মুগ্ধ হয়ে একমুহূর্ত তাকিয়ে বললেন, ইংরিজির বাংলা করে, "পেরেকের ঠিক মাথাটিতে হাতুড়ি মেরেছ বড়দা! হ্যাঁ, একথা অস্বীকার করব না, একসময় এগুলোর বানান লেখা হত ঙ-য় গ-এ—'ঙ্গ' দিয়ে। উচ্চারণও হয়তো ঐ রকম হত। কিন্তু পরে উচ্চারণে 'গ্' খসে গেছে, বাকি আছে শুধু 'ঙ'। এর উচ্চারণে জিভের পেছনটা আলতো করে আলজিভের গোড়াকার নরম তালু ছুঁয়ে থাকবে —আর নাক দিয়ে সাইরেনের মতো আওয়াজ বেরুবে —ঙ্-ঙ্-ঙ্। পেছন-পেছন 'গ্' যেন না আসে! বর্ষাকাল, ব্যাঙেরা তাহলে ঠ্যাঙ কামড়ে দেবে।"

"অর্থাৎ", ভণ্টুর বাবা বললেন, "ভাঙ্গা নয়, ভাঙা, বাঙ্গালি নয়,বাঙালি, শিঙ্গাড়া নয়, শিঙাড়া, ঝিঙ্গে নয়, ঝিঙে, ফিঙ্গে নয়, ফিঙে, চোঙ্গা নয়, চোঙা, আঙ্গুল নয়, আঙুল, লাঙ্গল নয়, লাঙল —এই তো ?"

"হাই, হাই!" জাপানি ভাষায় হ্যাঁ-হ্যাঁ বললেন হিগিনকাকু। তারপর চোখ বুজে বক্তৃতা দিতে লাগলেন, "কিন্তু সমবেত ভদ্রমহিলা ও মহোদয়গণ এবং স্নেহের হিজ্‌বিজ্‌বিজ্," বলে ভণ্টুর থুতনিটা নেড়ে দিলেন —"মনে রাখবে 'সঙ্গে'ই ঠিক, 'সঙে' ভুল, এইরকম 'বঙ্গ', 'ভঙ্গ', 'জঙ্গল', 'ভঙ্গি', 'সঙ্গী'। এগুলো 'ঙ্গ' দিয়ে লিখবে, 'অনুস্বার + গ' দেবে না, আর উচ্চারণেও 'গ্'কে আনবে। আবার বানান উচ্চারণে দু'রকমই হয় 'সঙ্গিন', 'সঙিন', 'রঙ্গন', 'রঙন'। এগুলোতেও 'গ' একসময় পুরোপুরি কেটে পড়বে বোধ হচ্ছে। বাকি থাকবে ঐ 'ঙ'।

"খবরদার, খবরদার! বাকিগুলোতে 'গ্' বলে ব্যাঙেদের গালাগাল খেতে যেয়ো না। 'গ' দিয়ে কত বিশ্রী সব গালাগাল আছে —গোরু, গাধা, গাড়ল —থাক বাবা আর বলব না!" (ক্রমশ)

ভোরে ওঠার ভাবনা

প্রসাদ

টেলিফোনে কার সঙ্গে যেন চম্বল কথা বলছিল :

"Yes, I'll be there early." ....

"I know the buses start at half past six." ....

"Yes, yes, I'll be in good time." ....

"No, half past six is not too early for me." ....

মিলি অবাক হয়ে শুনছিল। দাদা টেলিফোন নামিয়ে রাখতেই বলল :

"Half past six not too early for you!"

Chambal gravely replied, "Not when I'm catching a bus."

"I've never seen you get up before half past seven."

"You shall, if you're up early enough tomorrow. And I hope you remember that I used to go swimming in the lake before breakfast."

কিন্তু চম্বল যাচ্ছে কোথায় অত ভোরে ?

His school had arranged a day's outing for the boys. They were to go to a place a few kilometres from Calcutta and spend the day there. Each boy was to carry his own lunch in a box.

They had to start because they had to be back by the evening.

The boys had been told to report at the school at the crack of dawn on Sunday.

Chambal called it the "crack of dawn " but the notice at the school had said 6 O'clock in the morning.

"Can I get there by half past six? I'll have to ask Mummy to wake me at five," Chambal thought.

কিন্তু মায়ের যদি মনে না থাকে ! যদি ঘুম না ভাঙে ?

He remembered he used to go to the lakes three days a week last year.

He was learning how to swim then.

Mummy used to wake him up at half past five.

He also remembered Daddy went to the nearby park every morning for his morning stroll.

So, Mummy had to get up early, anyway.

Chambal felt assured he was not going to miss his bus.

এবারকার বাক্যগুলোতে লক্ষ করো, সময়ের কথা আর স্থানের কথা কেমনভাবে সাজানো হয়েছে, কোন্‌টা আগে কোন্‌টা পরে। যেমন :

I'll be (1) there (2) early.

অর্থাৎ সময়ের কথাটা আগে, স্থানের কথাটা পরে।

এবারে তোমরাই খুঁজে খুঁজে বার করো, কোন্ কোন্ বাক্যে সময়ের কথা আর স্থানের কথা এইভাবে আগে-পরে সাজানো আছে। তারপর সেই বাক্যগুলো আলাদা করে লিখে ফেলো। তারপর সেই ধরনের বাক্য তোমরা নিজেরাই যতগুলি পারো তৈরি করো।

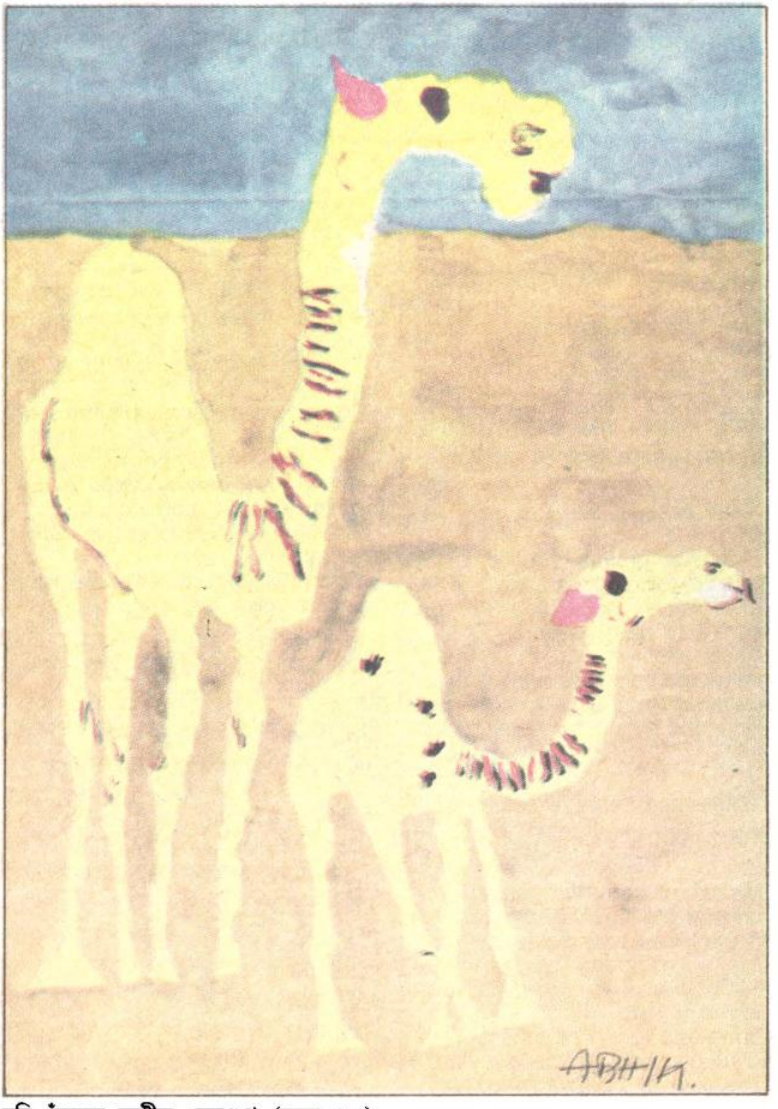

ছবি এঁকেছে **অভীক সেনগুপ্ত** (বয়স ১০)

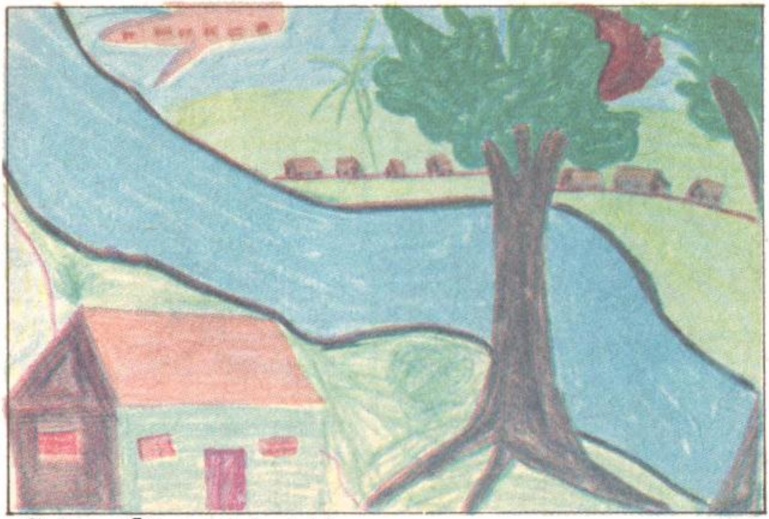

ছবি এঁকেছে **দীপঙ্কর দত্ত** (বয়স ৯)

ছবি এঁকেছে **অর্পিতা সান্যাল** (বয়স ৬)

শহর ও গ্রাম

গ্রামে শুধু গাছপালা
শহরে কান ঝালাপালা
আমার প্রিয় গ্রাম
এখানে নেই বাস ট্রাম
এখানে শুধুই সবুজ
ভোরের রবি লাল তরমুজ
তিলোত্তমা বসু (বয়স ১১)

বুলবুলি

রুমা বলে বুলবুলি
চল্ না রে ভাই ফুল তুলি
বুলবুলি তো যায় না
ফুল তোলা আর হয় না

গোপা চট্টোপাধ্যায় (বয়স ১১)

সিনেমা দেখতে হনুমান

আমাদের পাড়ায় রোজ সকালে একটা হনুমান আসছে। হনুমানটা পেয়ারা গাছের পেয়ারা খায়, নারকেল গাছের ফুল খায়।

কী বড় লেজ ওর। কালো মুখে দাঁত বের করে ভেংচি কাটে। আর কী বড় বড় লাফ দেয় গাছ থেকে গাছে, এ বাড়ি থেকে ও বাড়ি।

আমাদের এখানে 'রামায়ণ' সিনেমা চলছে, মনে হয় হনুমানটা সিনেমা দেখতে এসেছে।

উপালি সমাদ্দার (বয়স ৭)

ছবি এঁকেছে আনন্দমোহন ঘোষ (বয়স ১০)

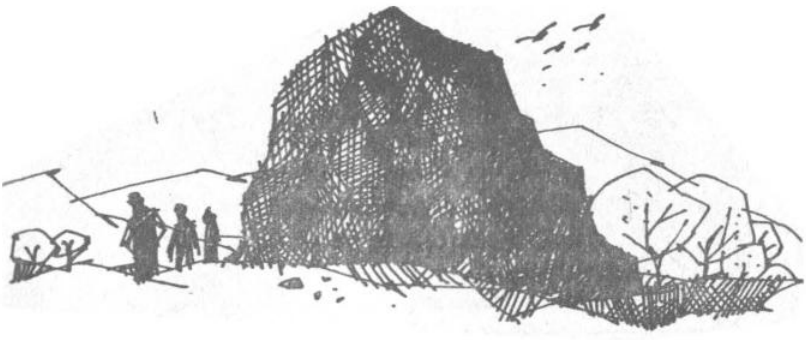

টিপিকপানিতে কিছুক্ষণ

'টিপিকপানি' নামটা অদ্ভুত, তাই না ? এটা ছোট্ট একটা পাহাড়ের নাম, আর পাহাড়টা আছে বিহারের সিংভূম জেলায়। আমি আর আমার এক দাদা এই পাহাড়ের পথে রওনা হয়েছিলাম সিনি থেকে। সিনি স্টেশনের কাছেই আমার মাসির বাড়ি, সিনিও সিংভূমে। সকাল নটায় খেয়েদেয়ে রওনা হয়েছিলাম।

একবার উঁচু একবার নিচু পথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে লোকালয় পেরিয়ে ফাঁকা মাঠে এসে পড়লাম। এখানে বছরে একবার মাত্র ফসল হয়, সেজন্য মাঠ এখন ফাঁকা। খেতের আলের ওপর দিয়ে যাওয়া অসম্ভব। কারণ, আল সরু, তার উপর আবার মাঝে-মাঝে ভাঙা। তাই প্রকৃতি যেন আমাদের মাঠে নামতে বাধ্য করল।

খানিকটা যাওয়ার পরে পথে পড়ল কয়েকটা কুলগাছ। গাছে কুল আছে, কিন্তু লোভ সংবরণ করলাম। কারণ, সামনেই বিদ্যাদেবী মা সরস্বতীর পূজা।

বহুক্ষণ বাদে পাহাড়ের কাছে এসে পড়লাম। পাহাড়ে উঠতে আরম্ভ করলাম আস্তে আস্তে। যেতে যেতে বেশ কিছু চেনা-অচেনা গাছ চোখে পড়ল। আরও কিছুটা ওপরে ওঠার পরে হঠাৎ বাচ্চার কান্নার আওয়াজ শুনতে পেলাম। কী ব্যাপার ? একটু এগিয়ে দেখি, একটা কুয়ো থেকে একজন মহিলা জল তুলছেন। তাঁর পিঠে বাচ্চা বাঁধা। বাচ্চাটা কাঁদছে তো কাঁদছেই সেই ক্রন্দনধ্বনি শান্ত পাহাড়ের পরিবেশকে যেন চিরে দিচ্ছিল।

আরও কিছুটা যাবার পরে আমরা একটা পাথরের ওপর বসলাম। তারপর নীচের দিকে চোখ পড়তেই অবাক হয়ে গেলাম। নীচের রাস্তা, খেত আর ছড়ানো-ছেটানো গাছগুলো একটা সাজানো বাগানের মতো দেখাচ্ছিল।

আবার এগোতে লাগলাম। হঠাৎ একটা শব্দ ভেসে এল বাতাসে। টিপ... টিপ...টিপ। কৌতূহল নিয়ে এগিয়ে গেলাম। তারপর দেখি, একটা মসৃণ কালো পাথর। কেউ যেন পরিষ্কার করে রেখেছে। তার উপর ফোঁটা-ফোঁটা জল পড়ছে। আর সেই ধ্বনি পাথরে পাথরে ধাক্কা খেয়ে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। কিন্তু জলের উৎস অনেক খুঁজেও দেখতে পেলাম না। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এলাম। ফেরার পথে বহুক্ষণ শুনতে পেয়েছিলাম সেই শব্দ—টিপ... টিপ...টিপ।

অরুণাভ বসু (বয়স ১৩)

বাঘা

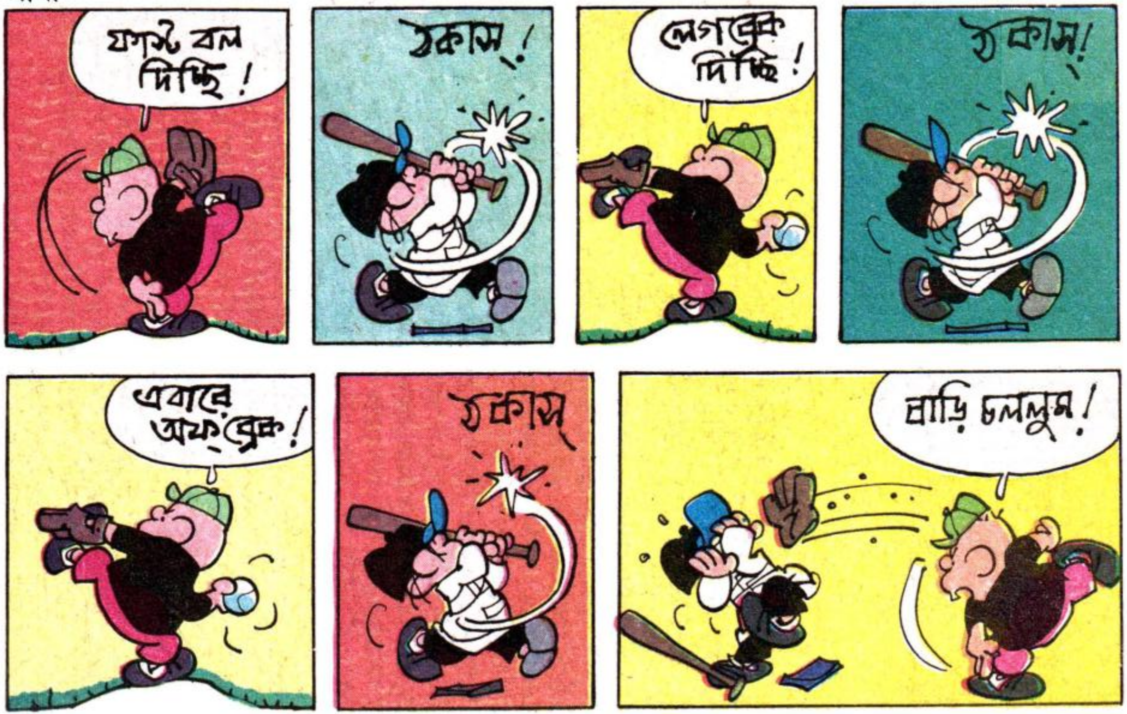

ফুল যেমন ওঠে ফুটে অপূর্ব
সৌন্দর্য্যে ভরিয়ে, আপনার
রঙের বাহারও তেমনি
ধীরে ধীরে উঠবে ফুটে,
সৌন্দর্য্যের চমক লাগিয়ে!
CROOKES
Lacto-Calamine
আপনার সৌন্দর্যে চমক জাগান, স্বাভাবিক উপায়ে — ল্যাকটো-ক্যালামাইন দিয়ে। আপনার রঙ, উজ্জ্বল দীপ্তিময় ও নিখুঁত ক'রে তোলার জন্যেই এটির প্রয়োজন। ঔষধিযুক্ত ক্যালামাইন আপনার ত্বককে সুরক্ষিত রাখে, ত্বকের যত্ন নেয় — এর ময়েশ্চারাইজার রাখে ত্বককে শিশির-কোমল ও তরতাজা করে — আর এর অ্যাস্ট্রিঞ্জেন্ট, মুখের ত্বককে টানে৷ টানো শোভাময় ও প্রাণবন্ত ক'রে রাখে। তাই তো, আপনার মত শোভাময়ী সুন্দরীরা, বছরের পর বছর ধরে ল্যাকটো-ক্যালামাইন এর ওপরই ভরসা ক'রে থাকেন।
তিনটি সাইজে পাওয়া যায়।
GJA: 1154 Ben
CROOKES
Lacto-Calamine
ক্যালামাইন • ময়েশ্চারাইজার • অ্যাস্ট্রিঞ্জেন্ট
রঙের বাহার সম্পূর্ণভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্যে

জীবন ও হনু আলোচনা করছে

আমাদের যোগাযোগের শতাব্দী সম্পর্কে

টেলিভিসন দেখবার সময় তোমাদের মনে হয় স্ক্রীনের সবটাই বুঝি একটানা আলোয় আলোকিত। এটি কিন্তু চোখের ভুল। আসলে স্ক্রীনটি হাজার হাজার ছোট 'ডট' দিয়ে তৈরী, সেগুলি আবার ৫২৫ টি সারিতে সাজানো! ঐ 'ডট'গুলি একটি একটি করে আলোকিত হয়ে ওঠে, বাঁদিক থেকে ডানদিকে, উপর থেকে নীচে। একে বলা হয় স্ক্যানিং; প্রতি সেকেণ্ডে সমস্ত স্ক্রীনটি ৩০ বার স্ক্যান করা হচ্ছে; এবং এটি এত দ্রুত সম্পন্ন হয় যে আমাদের মনে হয় এগুলি একই সঙ্গে আলোকিত হয়ে ওঠে। প্রত্যেকটি আলোকিত 'ডট' এর আলো আঁধারের বিভিন্ন ছায়ার মাত্রার তারতম্যে ফুটে ওঠে ছবি, যা তোমরা দেখ।

একবার ভেবে দেখ, মুহূর্তের জন্য যদি এই কাজ বন্ধ হয়, তাহলে, তুমি শুধু একটিমাত্র

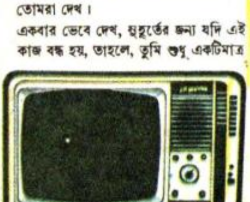

উজ্জ্বল বিন্দু দেখতে পাবে...আর চতুর্দিকে অন্ধকার।

দূর পাল্লার বেতার প্রচার সম্ভব হয়েছে আয়োনোস্ফিয়ার-এর কল্যাণে: যা হ'ল, ভূপৃষ্ঠ থেকে ৫০ থেকে ৪০০ কিমি উর্দ্ধে বিদ্যুৎপ্রবাহ চূর্ণীকৃত বাতাসের কণিকার স্তর। উপরের দিকে নিক্ষিপ্ত বেতার তরঙ্গ এইসব স্তরে ধাক্কা খেয়ে নীচের দিকে ফিরে আসে। বেতার কেন্দ্রগুলি এই প্রক্রিয়ার সদ্ব্যবহার করে, বহুদূরে অবস্থিত স্থানে সোজাসুজি বার্তা পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করে। বেতার তরঙ্গ এমন ভাবে বিক্ষিপ্ত হয় যাতে সেগুলি পৃথিবীতে ফিরে আসে ঐ বেতার

কেন্দ্রের অনেকদূরে।

টেলিফোনের মাধ্যমে তোমরা অনেক দূরের কথা শুনতে পাও এবং শোনাতে পারো। এখন ভি ডি ও-টেলিফোনে দুজন কথোপকথনরত ব্যক্তি তাদের পরস্পরকে দেখতে পারেন। টেলিফোনের সঙ্গে একটি ভি ডি ও ক্যামেরা যুক্ত থাকে, যেটি বক্তার ছবি তোলে...এবং অপর প্রান্তে আছে ভি ডি ও স্ক্রীন, যেটিতে অপর বক্তার ছবি ভেসে ওঠে (যা তার ক্যামেরায় তোলা হয়েছে) এমন দিন আসতে পারে যেদিন তোমার যাকে খুশি তাকেই দেখতে পারো...নিজের

আসন না ছেড়েই।

১০ই-এপ্রিল ১৯৮২ তে ভারত ইনস্যাট-১ এ নভোমণ্ডলে ছেড়েছিল। এই উপগ্রহটি প্রধান কেন্দ্রগুলির বেতার ও টি ভি অনুষ্ঠান পিক আপ করেছিল এবং বহু জায়গা জুড়ে শতশত গ্রামে তা ফেরৎ পাঠিয়েছিল, বড় শহরের মানুষেরা যে সব অনুষ্ঠান দেখে, চাষীভায়েরাও তা দেখবার সুযোগ পেয়েছে। এ বছর অগাস্ট মাসে ভারত থেকে ছাড়া হয়েছে ইনস্যাট ১ বি। এই উপগ্রহটি ভারত ও বিভিন্ন দেশের মধ্যে দ্রুত যোগাযোগ স্থাপন করতে সক্ষম হবে—কেবল টেলিফোনের মাধ্যমে।

জীবনবীমা হ'ল আপনার ভবিষ্যতকে সুরক্ষিত রাখার [illegible]াপদ ও নিশ্চিত উপায়। এই [illegible]য়ে বিশদ জে[illegible]নিন।

লাইফ ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া

1983 WORLD COMMUNICATIONS YEAR